নানান দেশের নানান সমাজ

ডঃ দিলীপ মালাকার

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক: শ্রীসতীশ চন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড,
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ পট
শ্রীকানাই পাল

নিবেদন

এই বই-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গত কয়েক বছরে। অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক যুগান্তর-এ। বাকিগুলো প্রকাশিত হয় 'অমৃত', 'মাসিক বসুমতি', 'জ্ঞান-বিজ্ঞান', 'জলসা' ইত্যাদি পত্রিকায়। এই বইটাকে প্রবন্ধের সংকলন বলা চলে।

"উত্তর-পূর্ব ভারতীয় ও পূর্ব-পকিস্তান পার্বত্য জাতিদিগের বিবাহ প্রথা" প্রবন্ধটি একযুগ আগে প্রকাশিত হয়। তার ভাষাশৈলি ভিন্ন। বিদেশে বই এর প্রুফ্ দেখা সম্ভব হয়নি। ছাপার ভুল কিছু আছে। এই ক্রটির জন্য আগে থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

বইটা অনেক আগেই ছাপা হয়ে বাজারে বেরুত কিন্তু কলকাতার দুঃখ-জনক পরিস্থিতির জন্য বেশ কিছুদিন ছাপা স্থগিত থাকে। এত গণ্ডগোলের মধ্যে প্রকাশক মহাশয় বইটাকে বাজারে ছাড়তে পেরেছেন বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

॥ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

জাতীয়তার বাণী মূর্তি হার্ডার (১৯৪৬)

Political and Social Writings of Benoy Sarkar (১৯৪৯)

অচেনা দার্শনিক বিনোদ চক্রবর্তী [শ্রীশিশির ভট্টচার্যের সহযোগে] (১৯৫১)

নেপোলিয়নের দেশে (১৯৫৮)

আগামিকালের সমাজবিজ্ঞানীদের জন্যে—

লেখক

সূচীপত্র

ইউরোপের জিপ্‌সি সমাজ

মধ্যযুগ হতে ইউরোপে পরিচিত জিপ্‌সি-সমাজ। তার আগে এদের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। মধ্যযুগ হতে একালের বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজে হয়েছে কত ওলট-পালট। কত তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। কিন্তু ইউরোপে জিপ্‌সি-সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখানেই বোধহয় জিপ্‌সি-সমাজের বিশেষত্ব। গত পাঁচশ বছরে জিপ্‌সিদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলনেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়নি।

জিপ্‌সিরা ইউরোপে বহুনামে পরিচিত। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে তাদের পরিচয় শিগান বলে। কখনো তাদের বলা হয় বোহেমিয়ান বলে। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি প্রদেশের নামই বোহেমিয়া। বোহেমিয়ান মানে ভবঘুরে। পশ্চিম ইউরোপে এরা পরিচিত 'জিতান' নামে। ইংরেজদের দেশে এরা জিপ্‌সি বলে পরিচিত। কিন্তু জিপ্‌সিদের ভাষায় তারা 'রোম' ও 'মানুষ'। 'রোম' শব্দটি নাকি হিন্দি থেকে এসেছে। এদের ভাষায় 'রোম' হচ্ছে পুরুষ আর 'রোমানি' (সং রমণী) স্ত্রী। মানুষ মানে আমাদের ভাষায় যা তাই। এদের ভাষায় প্রচুর হিন্দি, রাজস্থানি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ফলে এখানকার জিপ্‌সি ভাষা একটা জগা-খিচুড়ি। গ্রীক, হিন্দি, রাজস্থানি, শ্লাভ ভাষা, স্প্যানিশ শব্দ মিশিয়ে জিপ্‌সি ভাষার বর্তমান রূপ। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে আমি জিপ্‌সিদের দেখেছি অনেকটা আমাদেরই মতন দেখতে। তাদের ভাষায় প্রচুর ভারতীয় শব্দ। আমি বুলগারিয়ার অনেক জেলায় ও গ্রামে জিপ্‌সিদের দেখেছি যাদের ওরা বলে শিগান্‌, তাদের দেখলে মনে হবে যেন তারা উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থান থেকে

সম্ভ এসেছে। চেহারা পোশাকে রয়েছে রাজস্থানি ভাব। ওরা যখন কথা বলে তখন কতক শব্দ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি। এদের একজন আমায় দেখে আত্মীয়ের মতন আলাপ জুড়ে দিল। এখনও এরা চুলকে বলে 'কালো বলো', সূর্যকে বলে 'দেউ', চোখকে 'আঁখ', স্ত্রীকে 'রোমনি' এমনি আরও কত কথা। বুলগারিয়ার শিগানরা এখনও আনকোরা রয়েছে। ওদের মধ্যে আবার অনেক সামাজিক দলাদলি চলে। এক একটি উপজাতি অন্যের থেকে পৃথক। ভারত থেকে যারা এসেছে তাদের কথাবার্তায় বোঝা যায়। আরেক দল আসে ইরান-তুর্কি থেকে। এদের দল আসে গ্রীস হয়ে। তাই এদের ভাষায় গ্রীক ভাষার প্রাধান্য। এদের এবং ভারতীয় দলের একাংশ যায় উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেনে। স্পেন থেকে এরা যায় বৃটেনে, একদল আসে ফ্রান্সে। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে যে-সব 'জিতান' বা জিপ্‌সি আছে তাদের অর্ধেক এসেছে স্পেন থেকে, আর অর্ধেক পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারি থেকে।

আমি হাঙ্গারি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় শিগানদের দেখেছি মিশ্রিত চেহারায়। এরা একেবারে ফর্সা নয় আবার ভারতীয়দের মতন তামাটেও নয়। এদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ হওয়ায় এরা অন্য রকমের হয়েছে। বুলগারিয়ান শিগানদের মতন নয়। হাঙ্গারিয়ান জিপ্‌সিদের অধিকাংশ এখন নাইট ক্লাবে কাবারে ও সঙ্গীত-আসরে বাজনা বাজিয়ে থাকে। বিশেষ করে বেহালা। 'শিগানার অর্কেষ্ট্রা' শুধু হাঙ্গারি নয় সমগ্র মধ্য ইউরোপ জুড়ে খ্যাত।

বছর কয়েক আগে বুদাপেস্তের 'এষ্টোরিয়া' হোটেলের রেস্তোরায় খাচ্ছি। আমাদের টেবিলের সামনেই বাজাচ্ছিল এক-দল জিপ্‌সি 'শিগানার অর্কেষ্ট্রা'। আমায় দেখেই ওরা অতি সহজে চিনতে পারে আমি ভারতীয়। ওদের মধ্যে দু'জন ছিল একেবারে উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানের অধিবাসীদের মতন দেখতে। দোভাষীর মাধ্যমে তারা এসে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। তারা বলছিল

যে, তাদের পূর্বপুরুষরা নাকি এসেছে ভারতবর্ষ থেকে'। তবে অধিকাংশ ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশে গেছে। তাদের দেখে চেনা যায় না বটে, কিন্তু অনেকেই তাদের পুরোনো সংস্কৃতি ও ভাষা বজায় রেখেছে। আমাদের খাবার টেবিলের সামনে যে-সব জিপ্‌সি বাজনা বাজাচ্ছিল তাদের অনেকেই কিন্তু খাঁটি ইউরোপীয়দের মতন দেখতে। তারাও নাকি জিপ্‌সি। তবে তাদের মধ্যে যারা দেখতে ভারতীয়ের মতন তারাই আমার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতন আলাপ জুড়ে দেয়। তারাই বলছিল যে, এতক্ষণ তারা যা বাজাচ্ছিল তাকে হাঙ্গারিয়ানরা 'শিগান' সঙ্গীত বলে বটে, কিন্তু আসল জিপ্‌সি বাজনা তারা সাধারণত বাজায় না। আমাকে খুশী করার জন্যে তারা সত্যিকারের শিগান সঙ্গীত বাজিয়ে শোনাল। শুনে মনে হল যেন আমি উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান বা পাঞ্জাবের লোকসঙ্গীত শুনছি। এদের বাজনার সুর ও তাল অনেকটা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের মতন। এদের আদি নিবাস যে ভারতবর্ষে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বুলগারিয়ায় এমন কোনো শহর দেখলাম না যেখানে একটা দুটো জিপ্‌সি বা শিগান নেই। মেয়েদের চেনা যায় সহজে তাদের পোশাকে। তরুণী ও যুবতীদের দেখলে মনে হবে যেন ওরা পাঞ্জাব, রাজস্থান বা কাশ্মীর থেকে এসেছে। মেয়েরা এখনও খোঁপায় ফুল গোঁজে বা কখনো ফুলের মালা। পুরুষগুলো ইউরোপীয় পোশাক পরে বলে অনেক সময় তাদের চেনা যায় না।

বুলগারিয়ার রিলা পাহাড়ে রয়েছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'অর্থডক্স' খৃষ্টানদের মঠ। মঠটার বয়স হবে আটশ বছর। ওখানে এখন ট্যুরিষ্টদের বেজায় ভিড়। আমিও সেখানে দিন চার ছিলাম। সেখানে দেখি এক শিগান মঠের প্রধান গেটের কাছে বসে ট্যুরিষ্টদের জুতো পালিশ করছে। যে বাক্সটার ওপরে ট্যুরিষ্টদের পা-সুদ্ধ জুতো পালিশ করছিল সেই বাক্সের দুই ধারে দুই ফটো লাগান। একটি হল রাজকাপুরের আরেকটি নার্গিশের। আমি তো দেখেই অবাক। একে পাহাড় তার ওপর ওই মঠে দুই জনপ্রিয় ভারতীয়

চিত্রতারকার ছবি দেখব বলে কোনো দিন আশা করিনি। আমার চেয়েও বেশী আশ্চর্য হল ওই জুতো-পালিশকরা শিগানটি। আমি ভারতীয় জেনে তার কি আনন্দ। তৎক্ষণাৎ সে রাজকাপুরের 'হম আবারা হুঁ' গানটি গাইতে শুরু করে দিল। শুধু ওই জুতো পালিশ-করা শিগানটি নয়, বহু সংখ্যক বুলগেরিয়ান জিপ্‌সিদের মুখে শুনেছি ভারতীয় সিনেমার গান। যে-সব হিন্দি ছবি বুলগারিয়ায় যায় তাদের সব কটা ছবি শিগানরা নাকি ভিড় করে দেখে। ওরা বলে যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষ ভারত থেকে এসেছে সেইহেতু ভারতীয় ছবি তাদেরই ছবি। ওরা নাকি হিন্দি ছবি বুঝতেও পারে। গান তো ওদের কণ্ঠস্থ। রাজকাপুর-নার্গিস ওদের সবচেয়ে প্রিয় চিত্রতারকা। বুলগেরিয়ার অনেক ছোট শহরে একা হেঁটে চলেছি। রাস্তায় হয়ত একদল শিগানের সঙ্গে দেখা হল। তাদের মধ্যে ছেলে-ছোকরার দল আমায় ঘিরে ধরত এই বুঝে যে আমি বোধহয় কোনো ভারতীয় ছবির অভিনেতা। সুতরাং ছবি ও তাতে সই দাও।

বুলগারিয়ান জিপ্‌সিরা ভারতীয় দেখলে তারা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করে এই জন্যে যে, ওদের এখনও বুলগারিয়ায় একটু নিচু চোখে দেখা হয়। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। ভারতবর্ষের কথা দেশ-বিদেশে আলোচিত হয়। তাই তাদের গর্ব।

মাসখানেক আগে পূর্ব বার্লিনের 'সোফিয়া' হোটেলের দরজার সামনে দেখি এক ভারতীয় মুখ। তার কাছে যেতেই মনে পড়ল এ যে বুলগারিয়ার 'গ্লোবদিব'-এ সব চেয়ে বড় হোটেল ত্রিমঞ্জুমের বেহালা বাদক। নাম তার 'রাখ্‌মান। সে আমাকে দেখে নাম ধরে ডাকতে লাগল। আমি যেন তার কত পরিচিত। তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি এখানে কি করছ।' সে জানায়, পূর্ব বার্লিনে সোফিয়া হোটেলে যে বুলগারিয়ান অর্কেষ্ট্রা বাদকদল এসেছে সে তাদেরই একজন। বার্লিনে থাকবে মাস চারেক। তার বাড়ীর

কথা সব শুনলাম। তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় বুলগারিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ শহর গ্রোবদিবের ত্রিমঞ্জুম হোটেলে। ওই হোটেলের অর্কেষ্ট্রা দলে সে ছিল নেতা। তারই মুখে শুনেছি শিগানদের অনেক অজানা কথা। রাখমানের পূর্বপুরুষ শ দুই বছর আগে ভারতের উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করে পূর্ব ইউরোপের পথে বেরোয়। সেই দলের একটি অংশ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে বুলগারিয়ায়। এখান থেকে তাদেরই সম্প্রদায়ের একটি উপদল যায় হাঙ্গারী ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে। রাখনাদের ঠাকুরদা নাকি ভারতীয় ভাষা বলতে পারত। এদের সম্প্রদায় এখনও একই সঙ্গে করে সূর্যের উপাসনা ও ইসলাম ধর্ম পালন। এদের এই ছোট সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ব্রতকথা এখনও পালন করে থাকে। রাখমানই বলছিল যে, বুলগারিয়ার জিপ্‌সিদের মধ্যে রয়েছে অনেক সম্প্রদায়। একের সঙ্গে অন্যের নেই মিল। বুড়োরা আজও তাদের সেই পুরোনো আচার সংস্কৃতি পালন করে। কোথাও এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় না। আজ এখানে কাল ওখানে এই করে। কিন্তু তরুণ ও শিশুদের শিক্ষার ভার নিয়েছে বুলগারিয়ান সরকার। তার মতন অনেক শিক্ষিত যুবক যে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করে সভ্য-ভব্য হয়েছে। অধিকাংশ জিপ্‌সি এখনো সেই পুরোনো অবস্থায় রয়েছে। ওদের জন্যে বুলগারিয়ান সরকার অনেক প্রচেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ প্রায়। তবে তরুণ ও যুবকরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। হাঙ্গারী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডেও সেই অবস্থা। বুড়ো জিপ্‌সীদের নিয়ে মহা সমস্যা। এরা তাদের পুরোনো ভবঘুরে মনোভাব ত্যাগ করতে চায় না।

জিপ্‌সিরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে অনবরত ঘুরে বেড়ায় বলে মধ্যযুগে ইউরোপময় ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। জিপ্‌সিদের দেশ-বিদেশে যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ ও নাগরিকত্ব যাতে বন্ধ হয় তার জন্যে ইংলণ্ডে এক আইন পাশ হয় ১৩৯৯ সালে আর স্পেনে ১৪৯২ সালে।

এই দুই দেশের আইন প্রণয়নে বোঝা যায় যে, তাদের ভয় ও ঘৃণা ছিল অ-ইউরোপীয় জাতি সম্পর্কে। ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র জিপ্‌সিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না কোনোদিন। অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্ঞী মারি থেরো ১৭৬১ সালে নতুন আইনবলে অষ্ট্রীয়ায় জিপ্‌সি-সন্তানদের কেড়ে নিয়ে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার হুকুম দেন। ১৭৮২ সালে অষ্ট্রিয়ায় আরেক আইন প্রয়োগ করে প্রায় জিপ্‌সি উচ্ছেদ করার যোগাড় হয়। আইনের প্রধান বক্তব্য ছিল এই : যারা সৎ উপায়ে জীবিকানির্বাহ করে না তাদের নিশ্চিহ্ন করা উচিত। ফলে অনেক শিগানের প্রাণ যায়। এমন সব অদ্ভুত আইন পাশ হতে থাকে ইংলণ্ডে, স্পেনে, জার্মানীতে ও রাশিয়ায়। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের আমলে শিগানদের ক্রীতদাস হিসেবে গণ্য করা হত। তাদের নিয়ে ইউক্রেনিয়া ও ক্রিমিয় অঞ্চলে চাষবাসের কাজে লাগান হয়। তার পরবর্তী ইতিহাসও তেমনি রোমাঞ্চকর। পূর্ব ইউরোপের সোস্যালিষ্ট দেশ ছাড়া আর কোথাও জিপ্‌সিদের নাগরিক অধিকার নেই (তারা সেখানে ভবঘুরে বলে পরিচিত)।

এক ফ্রান্সেই দুই লাখ জিপ্‌সির বাস। প্যারিসের কাছে রোমাঁ্যা ভিল ও মঁরই এ দেখেছি জিপ্‌সি বা জিতানদের ছাউনি। ওরা ওখানে হয় মজুরের কাজ, কারখানার শ্রমিকের কাজ, মৃত্তিকা-শিল্পের কাজ, নয় তো তামার ঘটি-বাটি তৈরির কাজ করে থাকে। মেয়েদের অনেকে হাত-দেখা ও তুকতাকের কাজ করে প্যারিসে। প্যারিসের অনেক জনবহুল পাড়ায় কাফেতে দেখা যাবে জিপ্‌সি রমণী হাত দেখছে। এতে এদের রোজগার। ফরাসী জিপসিদের সমিতিও আছে। আছে এদের মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার নাম 'লা ভোরা মন্দিয়াল শিগান (আন্তর্জাতিক শিগান মুখপত্র)। এদের সমিতির সভাপতির নাম বইদা বুব্‌দ। দক্ষিণ ফ্রান্সের 'স্যাঁৎ মারি দ্য লা ম্যার'-এ প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে বসে ইউরোপীয় জিপসিদের সভা। ফ্রান্স ও স্পেনের অধিকাংশ জিপসি এখন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। তারা আসে স্যাঁৎ মারি দ্য লা ম্যার-এ তীর্থযাত্রা করতে। যিশুখৃষ্টের মাতা মেরি

হল জিপ্‌সিদের আরাধ্যা দেবী। তার উৎসবে এরা গান গেয়ে, গীটার বাজিয়ে যে শোভাযাত্রা বের করে তা সত্যি দেখবার মতন। আমি ওখানে দেখেছি জিপসিদের শোভাযাত্রা। তাদের ভাষায় কিন্তু খৃষ্টের বন্দনা। তাঁকে ঘিরে তাদের চলে সপ্তাহখানেক উৎসব পালন। সেই সঙ্গে চলে জিপসি সঙ্গীত ও গীটার বাজনার প্রতিযোগিতা।

ফ্রান্সে এখনও অধিক সংখ্যক জিপসী বাস করে দেখেছি কারাভান বা চলন্ত গৃহে। এখন আর তাদের ঘর ঘোড়ায় টানে না। টানে মোটরগাড়ীতে। অনেকে বাস করে তাঁবুতে।

জার্মানীতে আমি জিপসীদের চিহ্ন দেখতে পাইনি। জার্মানরাই বলেছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার বাহিনী পাঁচ লাখ জিপসীদের হত্যা করে। অপরাধ তারা জার্মান নয়। জার্মাণ জাত নয় বলে। যেমন ইহুদিরা। যুদ্ধের পরে জিপসীদের জার্মানী প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে। তামাটে রঙের জিপ্‌সীদের এখন জার্মানীতে বাস করা নিষিদ্ধ।

স্পেনে জিপসীদের দেখেছি অন্য রকমের। একালের স্প্যানিশ সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা গর্ব করেন তাঁরা জেনে রাখুন যে, স্প্যানিস নৃত্য ও গানে পূর্ণ প্রভাব রয়েছে জিপ্‌সীদের। জিপ্‌সীদের নাচে ভারতীয় নাচের তাল অনুভব করা যাবে অনায়াসে। জিপ্‌সী সম্প্রদায় এখনও স্পেনে বেশ প্রভাবশালী। কারণ স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই জাতীয় ক্রীড়া। এই ষাঁড়ের লড়াই-এ যে কজন বিখ্যাত যোদ্ধা তারা সবাই জিপ্‌সী। এরা এখনও তাদের ধর্ম ও গোঁড়ামি পালন করে চলে।

জিপ্‌সী-সমাজে বিয়ে-থা হয় তাদের মধ্যেই। ছেলে-মেয়ের বিয়ে ঠিক করে তাদের বাবা-মা। মেয়েকে ও মেয়ের বাপকে প্রচুর যৌতুক ও উপঢৌকন দিয়ে তবে বিয়ে করা যায়। তাই ভাবী স্বামীদের দিনরাত খেটে সেই অর্থ জোগাড় করতে হয়।

জিপ্‌সী-সমাজ, জিপ্‌সী জীবন ও প্রেম নিয়ে একটি ছবি

কিছুদিন হল তোলা হয়েছে ফ্রান্সে। ছবিটার নাম 'ক্রিশ রোমানি'। ছবিটিতে অভিনয় করেছে প্যারিসের কাছের জিপ্‌সীর দল। এদের নিজেদের বিচারালয়ে হয় বিচার। এদের মধ্যেও আবার আছে জাত-বাতের বিচার। এদের সম্প্রদায়ের নেতার কথা এরা এক বাক্যে শোনে। নেতার মৃত্যুর পর নির্বাচিত হয় আরেক নেতা। সে সব নাকি হয় স্বপ্নাদিষ্ট।

ফ্রান্স ও স্পেনের জিপ্‌সীদের দেখলে চেনা যায় না যে এরা এককালে ছিল ভারতীয়। তবে এদের ভাষায় বোঝা যায়। এদের অনেকে এসেছে উত্তর আফ্রিকা থেকে। তাই এদের মধ্যে আরবি শব্দের চলন। উত্তর আফ্রিকায় আরব ও আফ্রিকান সভ্যতার মিলন ঘটেছে। সুতরাং উত্তর আফ্রিকাগত জিপ্‌সীরা অনেকগুলো সংস্কৃতির মিলনে গঠিত। তাই তাদের ওপর অনেক সংস্কৃতির প্রভাব। এদের এক-একটি সম্প্রদায় এক এক রকমের ধর্ম পালন করে। তেমনি ভাষা।

পশ্চিম ইউরোপে জিপ্‌সীদের সামাজিক উন্নয়নকল্পে কোনো প্রচেষ্টা আমি দেখিনি। পূর্ব ইউরোপে সোস্যালিষ্ট দেশে দেখেছি এদের পরিবর্তনের দৃশ্য। পশ্চিম ইউরোপে এখনও জিপ্‌সীদের দেখা হয় সেকালের সার্কাস খেলোয়াড়, সঙ্গে নাচানো বা জন্তু নাচানোর খেলোয়াড়, হাত-দেখা বা জোচ্চোর বলে। ভারতেও তাই। ভারতে জিপ্‌সীরা পরিচিত বেদে বা সাপুড়ে বলে। তাদের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে ?

মার্কিন পরিবার ও সমাজ

পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা শুধু আমাদের দেশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়, পশ্চিম দেশেও এ সমস্যা দেশ-নায়কদের বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশে মার্কিন সমাজ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণাই সবাই পোষণ করে থাকেন। বিশেষতঃ সিনেমার মাধ্যমের ভেতর দিয়ে।

তারাও আমাদের থেকে কোনো অংশে কম সংসারী অথবা অ-গেরস্থ নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার ও সমাজ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সবারই অল্প-বিস্তর আছে।

প্রথমে মার্কিন পরিবার কিভাবে গড়ে ওঠে তারই আলোচনা করা যাক্।

প্রত্যেক মার্কিন কিশোর কিশোরীদের বাধ্যতামূলকভাবে "গ্রেড স্কুলে" লেখাপড়া শিখতে হয়। এরপরে এদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন যায় "উচ্চ বিদ্যালয়ে" কারিগরি বিদ্যা শেখার জন্যে। তারপর যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মত উদ্যম, ইচ্ছা ও আর্থিক সামর্থ্য থাকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। ওদেশে শতকরা ত্রিশজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডিগ্রির অধিকারী।

কিন্তু বেশীর ভাগই ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রেড স্কুল এবং হাইস্কুলএর পড়া শেষ করে জীবিকা নির্বাহের পথে নামে। কেউ কারখানায় শ্রমিক হিসাবে, কেউবা চাষী অথবা স্বাধীন ব্যবসায়ী আর নানা পেশায়।

গড়ে মার্কিন শ্রমিকের মাসিক রোজগার হচ্ছে ৭০৫।৭ পাই। সবচেয়ে কম মাসিক রোজগার ৪০০ টাকা। আমাদের দেশের শ্রমিকদের মাসিক রোজগার কত? পঞ্চাশ টাকার বেশী নয়।

আমেরিকায় প্রত্যেক চতুর্থ ব্যক্তির একখানা মোটরগাড়ী আছে, প্রত্যেক শ্রমিক বসবাসের জন্যে কম করে তিনখানা ঘর, একখানা রেফরীজেটার, টেলিফোন, আর একটা রেডিওর অধিকারী। শুধু তাই নয়, ওদের প্রত্যেকের ঘর-বাড়ী নিখুঁতভাবে গোছান ও চক্‌চকে।

এছাড়া আমেরিকায় প্রত্যেক জিনিস সস্তা।

যুদ্ধের দরুন জিনিসের দাম মাত্র তিন গুণ বেড়েছে। সেখানে আমাদের দেশে এগার গুণ।

মার্কিন যুবক যুবতীরা সাপ্তাহিক দেড় শ' টাকার কম রোজগারে বিবাহে সম্মতি দেয় না।

কয়েক মাস আগে "আমেরিকান ইনষ্টিটুট অব পাবলিক ওপিনিয়ন" এর প্রধান কর্মকর্তা ডক্‌টর জর্জ গেলপ-এর এগার বছরের গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। তা'তে তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক মার্কিন নরনারীর চিন্তায় বিবাহের বয়স হওয়া উচিত পুরুষের পক্ষে পঁচিশ আর নারীর পক্ষে একুশ বছর।

মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী ডক্‌টর পল মি গ্রিক্ (দি ফ্যামিলি সাইক্‌ল—আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল রিভ্যু—এপ্রিল' ৪৭, পৃঃ ১৬৪) বলছেন যে, মার্কিন নরনারীর বিবাহের বয়স ১৮৯০ সালের সময় থেকে ১৯৪০ সালে অনেক নীচে নেমেছে। যেমন—

	১৮৯০—১৯৪০
স্বামীর বয়স	২৬.১ – ২৪.৩
স্ত্রীর বয়স	২২.০—২১.৬

দশজন পুরুষের মধ্যে ছয়জন দোহারা চেহারা, তিনজন বেঁটে আর বাদ বাকিরা লাল চুলওয়ালা মেয়ে পছন্দ করে থাকে। বিবাহিত পুরুষেরা মনে করে থাকে যে, তারা অ-বিবাহিতদের চেয়ে অনেক সুখী। মার্কিন সরকার বিবাহিত ও অ-বিবাহিতদের থেকে যে আয়কর নিয়ে থাকে তার একটা হিসাব দেওয়া গেল। অ-বিবাহিতদের কিন্তু বিবাহিদের চেয়ে বেশী কর দিতে হয়।

নীট আয়		অ-বিবাহিত অথবা একক-এর কর		বিবাহিত দম্পতিদের কর	
৩,০০০	ডলার	৪৮৫	ডলার	৩৮০	ডলার
৪,০০০	”	৬৯৪	”	৫৮৯	”
১০,০০০	”	১,৪৩৪	”	১,২৯২	”
১০০,০০০	”	৬৩,৫৪১	”	৬৩,১২৮	”
১,০০০,০০০	”	৮৪০,১৪৭	”	৮৩৯,৭১৫	”

এতে দেখা যাচ্ছে বিবাহিতদেরই মোটামুটি লাভ। গড়ে প্রত্যেক মার্কিন পরিবারের কাম্য মাত্র তিনটি সন্তান। কিন্তু আসলে গড়ে প্রত্যেক পরিবার চার থেকে পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। মার্কিন স্ত্রীরা সবসময়েই তাদের স্বামীদের আর্থিক সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তাই সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ শ্রমিকএর ভেতর প্রায় ১ কোটী ৭৮ লক্ষ বা একচতুর্থাংশের বেশী স্ত্রীলোক। সুতরাং যে-সব মেয়ে চাকুরী করে, তারা সকালে উঠে সংসারের কাজ ও রান্না সেরে চলে যায় কারখানায় বা অফিসে। সেখানে সবার আগে ছেলে মেয়েদের রেখে যায় সরকারী পাঠশালায় কিম্বা "নার্সিং হোম"এ। দুপুরে এসে স্বামীও ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করে চলে যায় কাজে। দিনের শেষে কাজ থেকে এসে স্বামী-স্ত্রীতে সংসারের কাজে লেগে যায়। তারপর যায় আমোদ-প্রমোদের জন্যে ক্লাবে, হোটেলে আর সিনেমায়।

আর যেসব স্ত্রীরা কাজে যায় না, তাদের প্রত্যেককে একই সময়ে পাঁচটা কাজ করতে হয়। বাজারে যাওয়া, রান্না করা, ছোট ছেলে-মেয়ের দিকে নজর রাখা, টেলিফোন ধরা, কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা ও সেই যন্ত্রের দিকে নজর রাখা ও সদর দরজার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। এদের প্রত্যেককে সমস্ত কাজ নিজে হাতে করতে হয়। কারণ ঝি-চাকর রাখার মত ক্ষমতা শতকরা নব্বই জনেরই নেই। কারণ ঝি-চাকরের মজুরি শ্রমিকের সমান। কিন্তু বাঙালী সমাজে শহরে প্রায় মধ্যবিত্ত ঘরে ঝি-চাকর না হলে চলে না।

প্রত্যেক মার্কিন স্ত্রীদের রবিবার বাদে প্রত্যেকদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় উঠে কাজে লাগতে হয়। মার্কিনরা আমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ধার্মিক নয়। শতকরা ছিয়ানব্বুই জন মার্কিণ ভগবানে বিশ্বাসী। শতকরা ৭৬ জন মৃত্যুর পরে জীবন সম্বন্ধে উৎসুক। আর শতকরা পঞ্চাশজন চার্চে যায় নিয়মিতভাবে এবং একতৃতীয়াংশ ভাত খাওয়ার আগে ভগবানকে প্রার্থনা জানায়।

মার্কিন পরিবার সাধারণতঃ সুখী। তার প্রধান কারণ আর্থিক দিকটা বেশ সচ্ছল। চাকুরী না থাকলে আজকাল সরকার বেকারদের ত্রিশ ডলার (১ ডলার = ৩৷৵৫পাই) মাসে দিয়ে থাকে। তারপর অবসর প্রাপ্ত চাকরেদের মাসে ২৫ থেকে ৩০ ডলার দিয়ে থাকে।

বর্ত্তমানে মার্কিন সমাজে অনেক রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিবাহ ভঙ্গ (ডিভোর্স)। কারণ গত ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বিবাহভঙ্গের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। যুদ্ধের পরে আরও বেড়েছে। কারণ স্বামী স্ত্রীতে চার পাঁচ বছর ছাড়াছাড়ি হয়ে সৈনিক বিভাগের হয়ে কাজে থাকতে হয়েছে বিদেশে। বিদেশ থেকে ফিরে তাদের মধ্যে অনেকের মতের ও মনের পরিবর্ত্তন হওয়ায় বিবাহ ভঙ্গ হয়েছে ও হচ্ছে। তাছাড়া আরও কারণ আছে। পরস্ত্রী বা পুরুষের প্রতি আসক্তি। অত্যাচার, মাতলামি ও যৌন রোগ। নীচে গত কয়েক বছরের বিবাহ-ভঙ্গের হিসাব দেওয়া গেল।

(হাজারকরা হিসাবে)

১৮৯১—০'৭	১৯৩১—১'১০
১৯১১—১'০	১৯৪১—২'০
১৯২১—১'১০	১৯৪৬—৪'৩

বিবাহভঙ্গের পর সন্তানদের নিয়ে আরও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। তাই তাদের দেখাশোনার ভার পড়েছে সরকারের "সোস্যাল ওয়ার্ক" বিভাগের হাতে।

বর্তমানে অন্যান্য সমস্যার মধ্যে বিবাহও অন্যতম। এক হিসাবে জানা যায় যে, বাইশ হাজার কুমারীর বিবাহের কোনো সম্ভাবনা নেই। পাত্রের অভাবে।

এরপর আরও একটি সমস্যা হচ্ছে কুমারীর মাতৃত্ব ও কুমারদের পিতৃত্ব। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কুমারী-মাতার সংখ্যা হচ্ছে আঠার'শ (১৮০০)। এদের লাঞ্ছনার সীমা নেই। তাই তাদের রক্ষার ভার নিয়েছে সরকারের "সোস্যাল ওয়ার্ক" বিভাগ। এই সমস্ত কুমারী-মাতাদের জন্যে ১৮৪টি বিশেষ প্রসূতাগার খোলা হয়েছে। তাদের জন্যে সমস্তই আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা বিপথে না যায়। এদের বয়স যথাক্রমে উনিশ অথবা তার নীচে আর অর্ধেকের বয়স বিশ থেকে উনত্রিশ বছরের মধ্যে ("আনম্যারেড মাদার"—শ্রীমতী সুইস পারসান্‌স্। দি চাইল্ড পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৪৭, পৃঃ ৫৪)।

এছাড়া কুমার কুমারীদের যৌন জীবনও সমস্যার বিষয়। সমাজবিজ্ঞানী লেসলি বি হোমান এবং বারট্রাম শাফ্‌লার (আমেরিকা জার্ণাল অব সোসিওলজি, মে ৬৭, পৃঃ ৫০১-৭) এর গবেষণার ফলে জানা গেছে। তাঁরা ৪,৬০০ জন মার্কিন যুবকের যৌন জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। তাদের বয়েস ২১ হতে ৩৫ এর মধ্যে। তার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই সংখ্যার শতকরা বিশজন কৌমার্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এদের মধ্যে ৫০০ জন নিগ্রো ছিল। শিক্ষিতরা অ-শিক্ষিতদের তুলনায় কৌমার্য রক্ষা করে বেশী।

বিবাহের পুর্বে শতকরা ৭১ জন কুমার গৃহস্থ ঘরের কুমারীদের সঙ্গে যৌন-সঙ্গম করেছিল। সুতরাং কুমারীদেরও কুমারদের মত সমপরিমাণে কৌমার্যহানি করেছিল। কিন্তু মজার কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন গণিকার সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

আরও নানান নুতন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে মার্কিন সমাজ এবং তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থাও তারা করছে।

হোম ইকনমিক্স

হোম ইকনমিক্সের বাংলা অনুবাদ করলে চলতি ভাষায় হয়ে দাঁড়ায় ঘরের ধনবিজ্ঞান। অর্থাৎ গৃহস্থালির অর্থনীতি। স্কুলের পড়ান ডোমেসটিক হাইজিনের কাছাকাছি বিষয়বস্তু হলেও হোম ইকনমিক্স ডোমেষ্টিক হাইজিন নয়। আমাদের মূল ধন-বিজ্ঞানের এক শাখা মাত্র এই হোম ইকনমিক্স। ধনবিজ্ঞানের কাজ যেমন শুধু কেনা-বেচা বাজার দর টাকা পয়সার লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি। আয়তন এর যেমন সুবিস্তৃত সীমাহীন এর ক্রিয়াকলাপ। তেমনি হোম ইকনমিক্স এর কাজ হল শুধু একটি সংসারের দৈনিক জীবনের অর্থনৈতিক খতিয়ান। এর বিস্তৃতি বিরাট নয়। গৃহ কোণে আবদ্ধ গৃহিনীর নিজস্ব বিজ্ঞান। একটি সংসারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিজ্ঞানকে বলা চলতে পারে হোমইকনমিকস্।

যে কোনো পরিবারেব খাদ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অর্থনৈতিক বাজেট, ঘবদোব সাজানো আর কাপড়চোপড় অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষগুলোর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংঘবদ্ধ জ্ঞানই হল হোমইকনমিক্স। যে কোনো সংসারের অর্থনীতিক ও সমাজনীতিক পঠন-পাঠনএর আওতায় পড়ে। ধনবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ব্যক্তিগত জীবনের আর্থিক উন্নতি ও কেনা-কাটার কথাই বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু খালি একজনের কিম্বা একটা সংসারের উন্নতি সাধনই হোম ইকনমিক্সএর বিষয়বস্তু নয়, কোনো সংসারকে অধঃপতন থেকে তার উন্নতির পথ দেখান ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধনই তার আর এক দিকের কাজ।

হোম ইকনমিক্সের চিন্তা আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। য়ুরোপের কয়েকটা দেশ সবে তার পথ অনুসরণ করছে।

হোম ইকনমিক্স বর্তমানের পুরোপুরি বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তু হিসেবে পরিগণিত হওয়ার আগে আমেরিকার এটাই গৃহস্থলীর বিজ্ঞান নামে পরিচিত ছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনই উচ্চবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের বিশেষ পঠিত বিষয় হিসাবে এই হোম ইকনমিক্‌সই গ্রহণ করে থাকে আজকাল। ১৯২৮-২৮ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তিনশ বাইশটা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি কোর্সে হোম ইকনমিকস পড়ান হয়। এখন তার সংখ্যা হয়েছে ডবল।

মার্কিণ ছাত্রীরা এই বিষয়টি বিশেষ পছন্দ করেন এই জন্যে যে তাদের তো একদিন ঘরকন্না করতেই হবে সুতরাং তাদের সেই সংসার যাতে বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, এইটেই আজ তাদের প্রধান কার্য। উনবিংশ শতাব্দীর গৃহিনীদের গ্রামের বাইরে কোনো সংশ্রব প্রায় ছিলই না বল্লে চলে। কারণ ক্ষেতখামারের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারাই তাদের সংসার চলে যেত। তখন কলকারখানার দাপট ছিল না তাই ছিল না গৃহিনীদের বর্তমানের ঝঞ্ঝাট। কিন্তু বর্তমানের গৃহিনীকে ঘরে-বাইরের সবরকমের ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় রাত দিন। তাকে বাজার থেকে নানান জিনিষ সওদা করতে হয়। সময় তার হাতে কম কিন্তু কাজ প্রচুর। আবার অনেককে সংসার করেও নানান কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে সুন্দর করে সংসারের সব কাজ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গোছান যায় তার হদিস দেওয়া আছে এই হোম ইকনমিক্সের পাঠ্য বিষয়ে। কোন খাবারটা তাড়াতাড়ি তৈরী করা যায় অথচ পুষ্টিকর হতে হবে আর সেই সঙ্গে মুখরোচক। ঘরদোর গোছগাছ করার যদি কোনো নতুন পদ্ধতি কেউ আবিষ্কার করে আপনার সুবিধে করে

দেয় তবে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি থাকবে না। শিশুপালন করা একেবারেই ছেলে-খেলা নয়। তার ব্যবস্থাও হোম-ইকনমিক্সের আওতায় পড়ে। বাজার দর ও হিসেব রাখতে জানা অবশ্যই চাই।

ওদেশের হোমইকনমিক্স পাঠ্য বিষয়ে তিনটে বিভাগ রয়েছে। প্রথমতঃ হাতের কাজের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যেমন রান্না-রান্না, সেলাই-ফোঁড়াই ও অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজ। দ্বিতীয়তঃ সংসার পরিচালনার ক্ষমতা ও মেধার উন্নতিবিধান করা। যেমন শিশুপালন, সময় জ্ঞান, টাকা পয়সার বাজেট ও বাজারের ক্রয় নির্বাচন। এবং সর্বশেষে চাকরী করার প্রস্তুতি। শিক্ষয়িত্রী কিম্বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কর্মী হওয়ার শিক্ষাও বিশেষ করে শেখান হয়।

যাঁরা হোম ইকনমিক্স পড়ান তাঁরা এক একজন রসায়ন শাস্ত্র, জীব-বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানুতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। কারণ এগুলো নিয়েই তো হোম ইকনমিক্স-এর দেহ। আরও যে যে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শাস্ত্র পড়ান হয় সেখানে রীতিমতন ল্যাবরেটরি ও মিউজিয়ামের সাহায্য নিতে হয়। আর তাছাড়াও বিভিন্ন যন্ত্র বিজ্ঞানের সাহায্য অহরহ নিতে হয়ে থাকে।

যুদ্ধের সময় মার্কিণ সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোম ইকনমিক্স বিভাগের ভেতর দিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষ অপচয় না করে কি করে দেশের উপকার করতে পারেন গৃহিনীরা, তার স্বার্থকতা উপলব্ধি করেছেন জাতীয় সরকার। তাছাড়াও যুদ্ধের মধ্যে দুর্মূল্যের বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ পাওয়া দুস্কর এমন জিনিষ যাতে অল্পতে অথবা অন্যের পরিপূরক হয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারে এমন উপায় সব সময়ে সার্থক হয়েছে সরকারের। সুতরাং হোমইকনমিক্সএর উপকারিতা যদি মার্কিণ শিক্ষাবিদ্‌রা উপলব্ধি করে থাকেন তবে আমরাই বা করব না কেন। আমরা চাই আমাদের দেশেও হোম ইকনমিক্স পঠিত হোক।

মধ্যবিত্ত সমাজ (জার্মাণ)

কিছুদিন আগে পশ্চিম জার্মাণীর ন্যুরেমবার্গ শহরে জার্মাণ মহিলা সমিতির সম্মেলন বসে। সেই সম্মেলন হতে পশ্চিম জার্মাণ ঘর-সংসারের অনেক সংবাদ জানা গেল। এক জার্মাণ সমাজ-বিজ্ঞানী বলেছেন যে, পশ্চিম জার্মাণীর এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ পরিবারের মধ্যে শতকরা ৬৫%টির ঘর পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, ৪১% আছে রেফ্রিজারেটার, ৩০% জনের আছে কাপড় কাচার কল। তবে অনেক নতুন বাড়ীতে দুই-তিন পরিবারে মিলে একটি করে যন্ত্র পালাক্রমে ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিম জার্মাণীর অনেক নতুন বাড়ীতেই গ্যাসের উনুন নেই। সেখানে ইলেকট্রিকের উনুন ব্যবহার করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মাণীর অনেক বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে নতুন করে নির্মিত হয়েছে। নতুন নতুন বাড়ীতে ব্যবহৃত হচ্ছে নতুন যন্ত্রাদি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের কলকব্জা। জার্মাণ পরিবার তার মাসিক আয় থেকে মাসে ব্যয় করে ঘর ভাড়ার দরুণ শতকরা ১০%, পোষাকের দরুণ শতকরা ১৫ ভাগ, খাদ্যের জন্য শতকরা ৩৫ ভাগ, আসবাবপত্রের জন্য শতকরা ৯ ভাগ, আর যানবাহনের জন্য শতকরা ৫ ভাগ।

জার্মাণীর অধিকাংশ মেয়েরাই কাজ করে থাকে অফিস বা কারখানায়। তার প্রধান কারণ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অধিক সংখ্যক পুরুষ মারা গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা এখন বেশী। তাই মেয়েরা কাজ করতে বাধ্য। যে সমস্ত মায়েরা অফিস কারখানায় কাজ করে তাদের এক মাত্র সমস্যা হল তাদের সন্তানরা। কারণ তারা যখন

অফিসে বা কারখানায় তখন তাদের সন্তানরা ইস্কুলে। কিন্তু ইস্কুল ছুটির পর সেই সব ছেলে-মেয়ের দল কি করে? এই হল সমস্যা। যতক্ষণ মা বাড়ীতে না আসছে ততক্ষণ ছেলে-মেয়ের দল বাড়ীতে আসতে পারে না। হয় তারা রাস্তায় খেলা করে, না হয় তাদের বাড়ীর দোর গোড়ায় বসে অপেক্ষা করে। যাদের ঠাকুর্দা বা ঠাকুরমা আছে তাদের সে সমস্যা নেই। কিন্তু যাদের তা নেই? তাদের সমস্যা সব চেয়ে বড়।

যুগোশ্লাভিয়া

যুগোশ্লাভ সরকারের এক তথ্যানুসন্ধান থেকে জানা গেল যে, যুগোশ্লাভিয়ায় প্রতি বছরে এক লক্ষ সত্তর হাজারটি বিবাহ হয়ে থাকে। এবং সব কটি বিবাহ হয় প্রথমতঃ সরকারী রেজিষ্ট্রি মতে। তারপর যে যার ধর্ম্মমতে। বেলগ্রেডের কয়েকজন বিচারক বলেছেন যে, বিবাহের প্রথম কয়েক বছর হল কষ্টকর। তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করার দরুণ পরে অনেক দম্পতিকেই নিরাশ হতে হয়।

ওই সব বিচারকদের মতে যুগোশ্লাভিয়ায় প্রতি বছরে বিবাহ-যোগ্য তিন লক্ষের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ সত্তর হাজার বিবাহ করে। বিবাহভঙ্গের প্রধান কারণগুলোব মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, সহ্য ক্ষমতার অভাব, তাছাড়া রয়েছে মতবিরোধ। শতকরা সত্তরটি বিবাহভঙ্গের কারণ হল এই। বিবাহভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ হল অবৈধ যৌন সম্পর্ক, যার অধিকাংশই হল স্বামীর দল। শতকরা ১৭টি বিবাহভঙ্গের কারণ হল ওই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ওই সংখ্যা আসলে আরও অনেক বেশী, কারণ তারা বিচারালয়ে সব সময়ে তাদের অবৈধ যৌন সম্পর্কের কথা না বলে গোপন রাখে। এর পরে হল দুই পক্ষের আপোষমূলক মধ্যস্থতায় শান্তভাবে বিবাহ-

ভঙ্গ হয়—সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ায় শতকরা পঞ্চাশটি এবং বেলগ্রেড শহরে তার সংখ্যা শতকরা আশিটি।

যুগোশ্লাভিয়ার বিচারালয়ে বিবাহভঙ্গ মামলায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ স্থলে স্বামীর দলই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। বিচারকের রায়ে এইভাবেই বিবাহভঙ্গ হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে যুগোশ্লাভিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ। সেখানে বিবাহের ও বিবাহভঙ্গের আইন-কানুন অনেক সহজ।

ফরাসী সমাজের কয়েকটি চিত্র

সমাজ যখন আছে তখন সমস্যাও আছে। ফরাসী সমাজেও তার ব্যতিক্রম নেই। সব দেশেই সামাজিক সমস্যার পার্থক্য উনিশ-বিশের। তবে এক এক দেশের সমাজ ও সামাজিক কাঠামো এক এক রকমের। সামাজিক প্রথাও ভিন্ন। কিন্তু কয়েকটি প্রথা সব দেশেই সমান। সামাজিক সমস্যার চেয়ে আবার ব্যক্তির সমস্যা সব দেশের সমাজেই সমান।

ফরাসী সমাজ আমাদের মতন অত গোঁড়া বা রক্ষণশীল নয়। তবে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় একটু বেশী। মনে রাখতে হবে ফ্রান্সে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আধিক্যই বেশী, তারপর হল প্রোটেষ্টাণ্ট। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদের সম্পর্ক ইউরোপময় একই, দুই সম্প্রদায়ই খৃষ্টান কিন্তু এদের পার্থক্য যেন সাপ আর নেউলের। এতই বিরোধ দুই সম্প্রদায়ের যে, সে বিরোধের ঐতিহাসিক চিহ্ন এখনও রয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্সের সেভেন জেলায়। সেভেন জেলায় মধ্য যুগে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে যে লড়াই হয় সে লড়াইএ কত সুন্দর প্রাসাদ ও দুর্গ ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তারই ক্ষতচিহ্ন এখনও দেখা যায় সেভেন জেলার গ্রামে গ্রামে। ইউরোপের ইতিহাসে এই ধরণের লড়াই নতুন নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই হয়েছে প্রতি শতাব্দীতে। সে কথা অন্যত্র আলোচিত হবে।

সমাজগঠনের মূলে বিবাহের স্থানই প্রথম। এবং ইউরোপের অন্যদেশের মতন ফ্রান্সেও বিবাহ হয় সাধারণত প্রেম করে। সেই সম্পর্কে একটি ফরাসী জনমত পরিষদ আমাদের কাছে যে নতুন তথ্য তুলে ধরেছেন তারই একাংশ তুলে দিচ্ছি।

সম্প্রতি প্রেম ও বিবাহ নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর সংগ্রহ করেছেন। ফরাসী মহিলাদের কাছ থেকে ফরাসী জনমত পরিষদ। তার মধ্যে একশত মহিলা, যাদের বয়স ১৪ থেকে ৫০, তাদের তিন থেকে চার ঘণ্টা করে প্রশ্ন করে অনেক তথ্য বার করেছেন ওই প্রতিষ্ঠান, যা সত্যই উল্লেখযোগ্য।

ফরাসী জনমত পরিষদ বলেছেন যে, তাদের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে ফ্রান্সে দশটি মেয়ের মধ্যে ন'জনই বিবহ করে ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে এবং তারা যে ধরণের স্বামী পছন্দ করেন, তাদের মধ্যে প্রথম পছন্দ হল স্বামীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। শুধু মাত্র শতকরা পাঁচজন চান, তাদের স্বামীরা যেন উচ্চপদস্থ হন। ফরাসী মেয়েরা কি ধরণের স্বামী বা স্বামীর কোন্ ধরণের গুণ পছন্দ করেন, তার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

শতকরা পঞ্চান্ন জন ফরাসী মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামী হবার উপযুক্ত পাত্রের গুণ হবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব।

শতকরা উনচল্লিশ জন মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামীদের প্রধান গুণ হবে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য।

শতকরা ছয় জন মনে করে যে, তাদের স্বামীদের প্রধান গুণ হবে যে, তারা শুধু তাদেরই ভালবাসবে।

শতকরা পাঁচ জন মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামীরা হবে ভাল রোজগেরে, উচ্চপদস্থ ও সমাজের উঁচুতলার জীব।

শতকরা তিন জন মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামীরা তাদের জয় করে নেবে।

শতকরা দুই জন মনে করে যে, তাদের স্বামীরা হবে সুরুচিপূর্ণ।

শতকরা আট জন মনে করে যে, তাদের স্বামীদের সব রকমের গুণ থাকা উচিত।

এদেশে বিবাহ যেমন হয়, তেমনি ভাঙেও। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে পরিষদ বলেছেন যে, ফ্রান্সে আশী লক্ষ মেয়ের মধ্যে পয়ষট্টি লক্ষ মেয়েই বিবাহিতা। বাকি

পনরলক্ষ মেয়েদের মধ্যে দুইলক্ষ ত্রিশ হাজার বিবাহ ভেঙ্গেছে অর্থাৎ ডিভোর্স। দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার বিধবা। সাত লক্ষ ষাট হাজার মেয়ে অবিবাহিত, যাদের বয়স একুশ থেকে চব্বিশ, পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার অবিবাহিত, যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ, চার লক্ষ অবিবাহিতের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ।

ফরাসী জনমত পরিষদ বলেছেন যে, ফ্রান্সে দশটি বিবাহিত মহিলার মধ্যে একজন হল ডিভোর্সি, অর্থাৎ বিবাহ ভেঙ্গেছেন এবং তাদের বয়স সাধারণতঃ পঁচিশ থেকে, চৌত্রিশের মধ্যে। ডিভোর্স-এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাব, মাতলামি, নৃশংসতা কখনো স্বামীর তরফ থেকে, কখনো সমগ্র পরিবারের কাছ থেকে, চরিত্রহীনতা, আলস্য বা জুয়াখোরী।

ডিভোর্সের আগে এরা বিবাহ করে, বিবাহের আগে করে প্রেম। প্রেম করলে বা প্রেমে পড়লেই বিয়ে হয় না। প্রেমের সময়ে চলে বাছাবাছি। এমন অনেক দেখা গেছে যে, একটি মেয়ে হয় ত সাতটা ছেলের সাথে প্রেম করেছে। প্রেম করার আগে এরা চৌদ্দ থেকে ষোল বছর বয়সেই অনেক ছেলের সাথে পরিচিত হয়। ওটা প্রেম নয় শুধু পরিচয়। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন বয়সের মহিলারা যা উত্তর দিয়েছেন তার তালিকা দেওয়া গেল। উপরন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কত বছর বয়সে সাধারণতঃ একটি মেয়ে তার ছেলে বন্ধুর সাথে বেড়াতে যেতে পারে। তার উত্তরে এই পাওয়া গেছে :—

শতকরা পাঁচ জন মহিলা বলেছেন যে, চৌদ্দ থেকে পনেরো বছরের মেয়ে তার ছেলে বন্ধুর সাথে বেড়াতে পারে। শতকরা উনচল্লিশ জন বলেছেন, যোলো থেকে আঠারো বছরের হলে ভালো হয়। শতকরা পঁয়ত্রিশ জন বলেছেন, উনিশ থেকে বিশ বছরের হলে ভাল। শতকরা সাত জন একুশ বছরের পক্ষে, শতকরা দশজন বলেছেন যে মেয়েরা যেন কেবল মাত্র তাদের ভাবী-স্বামীদের সাথেই বেরোয়। শতকরা চার জন কোনো উত্তরই দেয়নি।

কিন্তু সবচেয়ে মজার হল এই যে, এই সব মহিলাদের মধ্যে যাদের বয়স একুশ থেকে চব্বিশ, তাদের শতকার পঞ্চাশ জনই বলেছেন যে, ষোলো থেকে আঠারো বছর বয়সেই মেয়েদের তাদের ছেলে বন্ধুর সাথে বেরোন ভাল। এঁরা বেশী বয়সে ছেলে বন্ধুদের সাথে বেড়ানোর বিপক্ষে। আর যে সব মহিলাদের বয়স পঁচিশ থেকে উনত্রিশের মধ্যে তাদের মধ্যে শতকরা তেতাল্লিশ জন ষোলো থেকে আঠারো বছরের ও একত্রিশ জন উনিশ থেকে বিশ বছরের মেয়েদের ছেলে বন্ধুদের সাথে বেড়াবার পক্ষে। কিন্তু যাদের বয়স চল্লিশের ওপরে এবং পঞ্চাশের মধ্যে তাদের মধ্যে শতকরা দুইজন মাত্র চৌদ্দ পনোরো বছরের মেয়ের ছেলে বন্ধুর সাথে বেড়াবার পক্ষে। সাতাশ জন শুধু ১৬—১৮ বছরের মেয়ের বেড়াবার পক্ষে। তবে শতকরা চল্লিশজন উনিশ থেকে বিশ বছরের মেয়েদের একলা বেড়াবার অনুমতি দিতে রাজী। আর এদের মধ্যে শতকরা বিশজন কেবল মাত্র ভাবী স্বামীদের সাথে বেড়াতে পরামর্শ দেন। অন্যদের সাথে নয়।

প্রেম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ফরাসী জনমত পরিষদ বলেছে যে, তারা সবাইকে প্রশ্ন করে—সত্যিকারের গাঢ় প্রেম কি সম্ভব? তার উত্তরে শতকরা চুয়াল্লিশ জন মহিলা বলেছেন যে, তা সম্ভব। তেত্রিশ জন মহিলা বলেছেন, "হয়ত সম্ভব"। শতকরা ষোল জন মহিলা বলেছেন যে, না তা সম্ভব নয়। আর শতকরা সাত জন কোন উত্তর দেননি। প্রশ্নকর্তারা নাছোড়বান্দা; তারা আবার প্রশ্ন করেছেন যে, অটুট প্রেম যদি সম্ভব হয়, তাহলে আপনি কি অটুট প্রেম সত্যি ভোগ করেছেন? তার উত্তরে শতকরা ২৯ জন মহিলা বলেছেন, হ্যাঁ।

উপরের প্রশ্ন সম্পর্কে অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যে যাদের বয়স পঁচিশের নিচে তাদের মধ্যে শতকরা ৬১ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী। শতকরা উনত্রিশ জন বলেছেন হয়ত সম্ভব। শতকরা সাত জন বলেছেন, না। কিন্তু এইসব অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যে

যাদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে তারা কিন্তু শতকরা ছত্রিশ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী। চৌত্রিশ জন বলেছেন হয়ত সম্ভব এবং শতকরা তেইশ জন বলেছেন, সম্ভব নয়। কিন্তু বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে যাদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে তাদের মধ্যে শতকরা সাতচল্লিশ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাস রাখেন। শতকরা তেত্রিশ জন বলেছেন, 'হয়ত সম্ভব', আর তেরো প্রতিশত জন বলেছেন, যে, তা সম্ভব নয়। আর যাদের .য়স পঁয়ত্রিশের ওপর তাদের মধ্যে আটত্রিশ জন অটুট প্রেমের বিশ্বাসী। তেত্রিশ প্রতিশত জন বলেন, হয়ত সম্ভব, ২১ শতকরা জন বলেছেন, সম্ভব নয়।

প্রেমটা মনের ব্যাপার। সুতরাং মনের এই বিচিত্র গতি উপলব্ধি করা সোজা নয়, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। তা ফরাসীই হোক আর বাঙালীই হোক। একই প্রায়। ফরাসী জনমত পরিষদের তথ্য থেকে এও জানা গেল যে, পাত্র নির্বাচন ব্যাপারে অধিকবয়সী মেয়েরা বেশ গোঁড়া। এটা দেখছি সব দেশেই প্রায় এক। বয়স বাড়ার সাথেসাথেই গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতা বেড়ে ওঠে।

মেয়ের পক্ষে ছেলে বাছাই করা আর ছেলের পক্ষে মেয়ে বাছাই করা সোজা ব্যাপার নয়। ওদের যদিও জাত-পাতের বাছ-বিচারের বালাই নেই কিন্তু সামাজিক স্তরের বাছ-বিচার চলে অনেক সময়। আয়এর ওপর নির্ভর করে সামাজিক স্তর।

সমগ্র ফ্রান্সে বিবাহের সময় শুধু সামাজিক স্তর বিচার করলেই হবে না। উপরন্তু দেখতে হবে সে স্থানটি কোথায়। গ্রাম, মফঃস্বল শহর না খাস পারী? মেয়েদের পক্ষে তাদের ভাবী স্বামী বেছে নেওয়ার উপযুক্ত জায়গা শহরে যেমন, গ্রামে তেমনি নয়। শহরে প্রায়ই নাচ বা জলসার আয়োজন থাকে এবং সেই সব নাচঘরে মেয়েরা হয়ত খুঁজে পায় তাদের মনের মানুষ। গ্রামে কিন্তু সচরাচর তা হয় না। তাই গ্রামে মেয়েকে খুঁজে বার করতে হয় তারই

জানাশোনা ওই গ্রামের পরিবারের মধ্যে। সাধারণতঃ গ্রামের মেয়ে তার নিজের গ্রামেই বিবাহ সাঙ্গ করে।

মফঃস্বল শহরে নাচ বা জলসার আয়োজন প্রায়ই হয়। সেখানে মেয়েরা খুঁজে পায় তার মনের মানুষ। অবশ্য এ ভাবা সমুচিত নয় যে সবাই বুঝি নাচ বা জলসাঘরেই তাদের পাত্র-পাত্রী খুঁজে পায়। ওটা একটা অংশ মাত্র। পারিসের বেলায় অন্যরকম। সাধারণতঃ মেয়েরা যখন কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয় তখন তারা পরিচিত হয় অন্য আরও ছেলের সাথে। সেখানে হয় ত বন্ধুত্বের সূত্রধরে শেষে পরিণয়সূত্রে বাঁধা পড়ে।

তার ওপর প্যারিসের সমাজে রয়েছে স্তর বিন্যাস। উঁচু-তলার জীবেরা যেমন তাদের তলার জীবদের সাথে লেনদেন করেন তেমনি নিচু-তলার জীবেরা ওই নিজের সাথে। তবে উঁচু ও নিচু তলার মধ্যে বিবাহ হয় গুণের জোরে। সে হয় রূপের গুণে নয় তো ছেলের বিদ্যা ও কর্মক্ষমতার গুণে। এ ধরণের আদান-প্রদান প্রায়ই হচ্চে। তবে মফঃস্বল শহরের মতন নাচ বা জলসায় মেয়েরা ছেলে বাছে না বেশী। তারা পরিচিত হয় বন্ধুদের বাড়ীতে। ছেলে ও মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়।

একটা সত্যি ঘটনা বলছি. আমার পরিচিত একটি ফরাসী ছেলের কিছুদিন আগে বিবাহ হল। বিবাহে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি, হয়েছি পাত্রীকে দেখে। কারণ পাত্র ধর্মে প্রোটেষ্টাণ্ট। ক্যাথলিক মেয়েদের সাথে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। সে যে একটি প্রোটেষ্টাণ্ট মেয়ের সাথে আগেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল তা জানতাম না। শেষে তার কাছ থেকেই জানলাম যে, বাপ মায়ের একান্ত ইচ্ছে যেন সে তাদের সম্প্রদায়ের মেয়েকেই বিবাহ করে। নইলে অনেক গণ্ডগোল। তার মধ্যে প্রধান হল সন্তান নিয়ে। সন্তানেরা কোন্ ধর্ম গ্রহণ করবে সেই হয়ে ওঠে বড় প্রশ্ন। বাবা ক্যাথলিক মা প্রোটেষ্টাণ্ট তখন কার ধর্ম গ্রহণ করবে সন্তানরা, সে সমস্যাই হয়

প্রবল। ওই সমস্যা এড়াবার জন্যেই অনেকে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করতে চায় না। অবশ্য এদের বামুন-কায়েতের সমস্যা নেই। সে বিষয়ে এরা উদার বিদেশীদের বেলায়ও। বিবাহটা আসলে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং ব্যক্তির অপছন্দের ওপর যতটা নির্ভর করে ততটা সামাজিক বিধি নিষেধের উপর নয়। আগেই বলেছি যে, বিবাহটা যতখানি ব্যক্তিগত ততখানি সামাজিক ঠিক নয়। ইউরোপময় একই ব্যাপার।

একটি কুমারী তা তিনি যে বয়সেরই হোন না কেন এবং একটি অবিবাহিত ছেলের পক্ষে বিবাহ যতখানি সমস্যা নয়, তার অনেকখানি সমস্যা একটি বিবাহভঙ্গকারীর বা বিধবার। বিবাহ-ভঙ্গকারিণী বা বিধবা বয়সে তরুণী হলেও তার পক্ষে বর জোটান অতি সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু একটি অবিবাহিতা বেশী বয়সের কুমারীর পক্ষে তত কঠিন নয়। ছেলেদের বেলায় অবশ্য ততটা নয়। তার ওপর কুমারী-মাতাদের সমস্যাও কম নয়। অবিবাহিতা মায়েদের বিবাহসমস্যা একটি বড় রকমের সমস্যা। তাই এই সব অবিবাহিতা মায়ের দল, বিবাহবিচ্ছেদকারীর দল, বিধবার বা বিপত্নীকের দল সংবাদপত্রের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়।

সংবাদপত্রে বিশেষ করে বহুল প্রচলিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলোতে প্রায়ই পাতা ভরতি বিজ্ঞাপন চোখে পড়বে। ওই ধরণের সাপ্তাহিক পত্রিকার কয়েকটি বিজ্ঞাপনের নমুনা দিচ্ছি।

এক মহিলা বিজ্ঞাপনে বলেছেন; বিধবা, ষাট বছর, দেখতে সুন্দরী, চুলের রং কটা, বাষট্টি থেকে সাতষটি বছরের বর খুঁজছি, বিপত্নীক বা বিবাহ বিচ্ছেদকারী হলে আপত্তি নেই। আগ্রহশীল পাত্র ছবি পাঠান ও পত্র লিখুন।

আর একজন লিখেছেন; বয়স মাত্র আঠাশ, দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন ফুট, দেখতে সুন্দরী, ব্যাঙ্কের কেরাণী, বিয়ে করতে ইচ্ছুক এমন পাত্র খুঁজছি, পাত্রের বয়স চল্লিশের মধ্যে হওয়া চাই।

আর একজন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন; বয়স বিয়াল্লিশ, বিবাহ

বিচ্ছেদকারী, দৈর্ঘ্যে চার ফুট, ওজন বাহান্ন সের, দেখতে সুন্দরী, হৃদয়পরায়ণা, ভালপরিবারের, বিবাহে সত্যিই আগ্রহশীল, কারুর সাথে ঝগড়া করতে প্রস্তুত নয়, পাত্রের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে হওয়া চাই। পাত্র শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন হলে ভাল হয়।

পুরুষের দলও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাঁদের একজন লিখেছেন: বয়স বত্রিশ, দৈর্ঘ্যে চার ফুট, ভাল স্বাস্থ্য, চরিত্র ভাল, ধর্মে ক্যাথলিক, অবিবাহিত, পেশা ক্ষৌরকর্ম। ২৫—৩০ বয়সের পাত্রীর সন্ধানে, পাত্রী হবে সুন্দরী, কোমল, সরল ইত্যাদি।

আর এক জন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন; ফরাসী সামরিক-বাহিনীর কর্মচারী, বয়স চল্লিশের ওপর, অবিবাহিতা বা বিধবাকে বিবাহ করতে রাজী, বয়স আটত্রিশের মধ্যে হওয়া চাই। পাত্রীর কি ধরণের রুচি তা প্রকাশ করে লিখুন।

আরেকটি বিজ্ঞাপনে; মহাশয়ের বয়স বাহান্ন, বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে, ভাল আয় রন্ধনশালার প্রধান ওই বয়সের পাত্রী খুঁজছেন, বিবাহবিচ্ছেদকারিণী বা বিধবায় আপত্তি নেই।

এই ধরণের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখা যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তার ওপর রয়েছে প্রজাপতি অফিসগুলোর বিজ্ঞাপন। প্রজাপতি অফিসগুলোর সংখ্যাও অল্প নয়, এক প্যারিস শহরেই প্রায় গোটা পঁচিশেক প্রজাপতি অফিস রয়েছে। তাদের একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে এবং বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, "একলা, একলা দিন কাটাবেন না, দোকলা হোন, বিবাহ করুন। বিবাহের সব আয়োজন করে দেবে নিম্নলিখিত প্রজাপতি অফিস। চিঠি লিখুন বা টেলিফোন করুন।" আরও কয়েকটি প্রজাপতি অফিস লিখছে যে, "বিবাহের জন্য অযথা ভাববেন না। আমরা আপনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

অবশ্য এও ভাববার কোনো কারণ নেই যে সব ফরাসীই বুঝি বিবাহের জন্যে বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন হন। যাঁরা বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন হন তাঁদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে সেটা একটা সমস্যার

মধ্যেই ধরা হয় না। এদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা বিদেশী, বা যাঁরা নিচুতলার লোক, হয়ত বিবাহ ভেঙ্গেছে, দেখতে তেমন ভাল নয় বা অবিবাহিতা মাতা, এদের এই সব প্রজাপতি অফিসের শরণাপন্ন হতে হয় অনেক সময়। তবে শিক্ষিত সমাজে এটা সমস্যা নয়। সমস্যাটা অল্প-শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের মধ্যেই আবদ্ধ। বিবাহের যখন দিন ঠিক হয় তখন থেকে পাত্র-পাত্রী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিবাহটা প্রথমে হয় শহরের বা গ্রামের পৌরসভার অফিসে। পৌরসভার মেয়র বা তার সহকর্মী সরকারী আইনকানুন পড়িয়ে শোনান দুই পক্ষকে, তারপর দুই পক্ষকে করতে হয় চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর, স্বাক্ষরের পাশে পাত্র ও পাত্রীর, হয় তাদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের কেউ, সাক্ষীর সই। এই যে পৌরপ্রতিষ্ঠানের অফিসে রেজিষ্ট্রি করে বিবাহ হল, সে হল পাকা সরকারী বিবাহ। সরকারী মতে বিবাহ সবাইকে করতে হয়; তারপর আরেক দিন হবে ধর্ম মতে বিবাহ। সে বিবাহ সম্পন্ন হয় গীর্জায়। ক্যাথলিকরা যায় ক্যাথলিক গীর্জায়, প্রোটেষ্টাণ্টরা যায় প্রোটেষ্টাণ্ট গীর্জায়। ইহুদিরা যায় সিনেগগএ। ধর্মীয় বিবাহ সম্পন্ন যেদিন হয়, সেদিনই নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী চলে যায় মধু-চন্দ্রিকা যাপনে। তবে যে যার আর্থিক সাধ্যমতে। যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে সে যায় দূর দেশে বা বিদেশে। যার সে সচ্ছলতা নেই সে যায় ধারে কাছে কোথাও। মধু-চন্দ্রিমার কয়েকটা দিন কাটে নববিবাহিতের স্বপ্নের মধ্যে। অবশ্য ট্যাঁকে টান না পড়লে কোনো অঘটন ঘটে না। অথবা কোন মানসিক দুর্ঘটনা না ঘটলে তারা ফেরে নির্বিবাদে। নইলে সেই সময়েই হয়ে যায় অনেকের বিবাহবিচ্ছেদ। তবে সাধারণতঃ ক্যাথলিকদের মধ্যে সহজে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। কারণ ক্যাথলিকরা বড়ই গোঁড়া ও রক্ষণশীল, ধর্মীয়মতে বিবাহ হওয়ার দরুন তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেনা। তারা তাই নতুন পথ ধরেছে, সে পথ হল পৃথক থাকার। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে পৃথক থাকছে

তাদের সংখ্যা সমগ্র ফ্রান্সে কম নয়। বরং বিবাহ-বিচ্ছেদকারীর চতুর্গুণ এই পৃথক বসবাসকারীর দল।

বিবাহটা যত সহজ ততটা নয় বিবাহের আনুসঙ্গিক পর্ব সমাধা করা। বিবাহে নিমন্ত্রণ ইত্যাদির আর্থিক ব্যয় সব দেশেই একটা সমস্যা। তবে এখানে এদের এই সমস্যা আমাদের মতন অত প্রকট নয়। এরা আয় বুঝে ব্যয় করে। তার ওপর আরও বড় সমস্যা হল নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নে ও তাদের অভ্যর্থনা জানাবার স্থানাভাব। গৃহ সমস্যা যেখানে প্রকট সেখানে অভ্যর্থনা জানাবার স্থান কোথায়। তাই এরা শরণাপন্ন হয় হোটেল রেঁস্তোরার। সাধারণতঃ অনেক পরিবার খালি বাড়ী ভাড়া নেন একদিনের জন্য। প্যারিসে অনেক সাজান-গোছান বাড়ী আছে। সেখানে ঘরগুলো বেশ প্রশস্ত। সেই সব বাড়ীতে বসে বিবাহবাসরের অভ্যর্থনা। সেখানে একঢিলে দুই পাখী মারা যায়। অল্পখরচে বিরাট আয়োজন। অর্থাৎ শুধুমাত্র পানীয় আর কিছু খাবার দিয়ে শত শত আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করা হয়ে থাকে। কারণ মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজনে সবাইকে আপ্যায়ন করতে গেলে নববিবাহিত দম্পতিকে দেউলিয়া হতে হবে। তার বদলে পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের ওই অভ্যর্থনা সভায় আপ্যায়ন করে, শেষে মাত্র নব দম্পতির বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়দের ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া উপায় নেই। এরা আমাদের মত অত অতিথিপরায়ণ বেহিসাবী নয়, যে ঘটিবাটি বিক্রি করে বিবাহের নিমন্ত্রণসভার আয়োজন করবে। বিবাহ উপলক্ষে পাত্র-পাত্রীর বাবা-মা কখনই দেউলিয়া হন না। এটা রীতি তো নয়ই বরং এরা এটাকে মুর্খতা বলে মনে করেন। কারণ একদিনের আনন্দ দিতে গিয়ে পাত্র বা পাত্রীর পরিবার পক্ষ যে সারা বছর অনাহারে কাটাবে তেমন চিন্তা এঁদের মাথায় আসেই না।

উপহারের বেলায়ও তাই। বিবাহ উপলক্ষে ফরাসী সমাজে

উপহারটা মুখ্য নয়, গৌণ। অতিথিরা আসেন বিবাহবাসরে, গল্প গুজব করেন, চলে যান। কেবল মাত্র বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের দল সাধ্যমত টুকিটাকি উপহার দ্রব্য দিয়ে থাকেন। আর পাত্র-পাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে এমন সব জিনিষপত্র যা নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর সংসারে ব্যবহৃত হবে দৈনন্দিন জীবনে। গহনার বালাই নেই। যা আছে তা পোষাকের। এরা গহনা বা পোষাকে বেশী অর্থ খরচ করে না বিবাহের সময়ে, বরং খরচটা করে নতুন ঘর সাজাতে, ঘরের আসবাব বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ে। উপহারের ব্যাপারে এরা বাস্তববাদী।

বিয়ের পরে সংসার সুরু হয়। সুরু হয় সাংসারিক ঝামেলা। সে ঝামেলা ফ্রান্সে যেমন, তেমন বাংলা দেশে। কিন্তু আমাদের সংসারে যে অশান্তি হয় তার কারণ যতটা অর্থনৈতিক ততটা নয় সামাজিক। ফরাসীদের বেলায় সাংসারিক অশান্তিতে অর্থনৈতিক কারণটা খুব বড় নয়। কারণ এদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রায় সবারই রয়েছে অল্প-বিস্তার। প্রথমতঃ এদের কারুরই চাকরি-বাকরির ভাবনা ভাবতে হয় না। চাকরি বা কাজ একটা না একটা প্রত্যেকেরই আছে। সুতরাং আর্থিক চিন্তার বালাই নেই। উপরন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ করে শতকরা ষাটজন বিবাহিত স্ত্রীলোকই একটা না একটা কাজ করে। তাদের বেশীর ভাগ হয় আফিসের কেরানী, টাইপিষ্ট, দোকানের কর্মচারী অথবা দোকানের মালিক। পুরুষরা করে ভারী কাজ। কল-কারখানায় কাজ। দুই তরফের আয়ে তাদের সাধারণতঃ আর্থিক দুশ্চিন্তার কারণ নেই। উপরন্তু চাকরি না থাকলে পায় বেকারভাতা, অসুখবিসুখের সময় পায় প্রায় বিনাখরচে চিকিৎসা। মাতৃত্বের সময় বিনাখরচে চিকিৎসা। সন্তান জন্মালে তার চিকিৎসা ও ভরণপোষণের দরুন মাসিক ভাতা। তার ওপর রয়েছে বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা। আর কি চাই? এমনকি বছরে কম করে পনর দিন বেতনসহ ছুটি ভোগ। বলা বাহুল্য যে, সব কিছুই সরকারী ব্যবস্থা।

এহেন অবস্থায় আর্থিক কারণে সচরাচর সংসারে অশান্তি ঘটতে পারে না। যা হয় তা হল সামাজিক কারণে।

প্রথমতঃ হল চরিত্রের প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ মাতলামি, নৃশংসতা। তৃতীয়তঃ পরিবারে শাশুড়ীর জ্বালাতন। সচরাচর চরিত্রের প্রশ্ন ওঠে, স্বামীর পরস্ত্রীর দিকে অতি মনোযোগ বা স্ত্রীর পরপরুষের প্রতি অতি মাত্রায় ভালবাসা বা গোপন ব্যভিচার। এই ব্যাপার সুরু হলেই ধরে সংসারে ভাঙ্গন। তার পরিণাম পৃথক থাকা নয়তো বিবাহবিচ্ছেদ। সংসারে অশান্তির কারণের মধ্যে মাতলামি এবং নৃশংসতাও কম নয়। সর্বশেষ হল শাশুড়ী সমস্যা। অর্থাৎ স্ত্রীর মা এসে সংসারে গণ্ডগোল বাধাতে যেমন চেষ্টা করেন তেমনি স্বামীর মা এসে সংসারে। উভয় পক্ষের শাশুড়ী সমস্যা একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হয় তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নয় তো তাদের খপ্পরে পড়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ। তবে এই ধরণের সমস্যা বড় বেশী দূর গড়ায় না। কারণ স্বামী ও স্ত্রীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তারা ওই সব সমস্যায় আদপে গুরুত্ব দেয় না।

ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের মতন ফ্রান্সেও বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা এক মহা সমস্যা। কারণ পরিবারে ছেলে মেয়েরা বিয়ে করে যে যার পথ দেখে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার অবস্থা তখন হয় শোচনীয়। তাঁরা যতই বার্দ্ধক্যের পথে পা দিতে সুরু করেন ততই অনুভব করেন নিঃসঙ্গতা। কারণ ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করে এমন কোন দূর দেশে বাসা বেঁধেছে যে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কদাচ হয়। বৃদ্ধ পিতা-মাতার হয়ত নেই আর্থিক কষ্ট কিন্তু মানসিক কষ্ট রয়েছে। এ সমস্যার শুধু টাকা দিয়ে সমাধান হতে পারে না। এ হচ্ছে মানবিক সমস্যা। এদিক দিয়ে ইউরোপীয় সমাজ আমাদের কাছে অনেক পিছনে।

ভবিষ্যত জানার বা অদৃষ্টপরীক্ষা করানো সব দেশেই একটা বাতিক। কেবল মাত্র সে সুযোগ নেই কম্যুনিষ্ট শাসিত দেশে। যদিও লুকিয়ে-চুরিয়ে সে কাজ যে চলে না তা নয়। কিন্তু প্যারিসের

রুসঁ৷ জ্যাক্ রাস্তার ওপর চার পাঁচটা দোকান রয়েছে, যারা শুধু ভাগ্য গণনা, তুকতাক্, পরকালের চিন্তা বা প্রাচ্য দশন নামে অনেক গাঁজাখুরি বইএর ব্যবসা করেন। এদের ব্যবসায় কখনো ভাঁটা পড়ে না। কারণ লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর মধ্যে অন্ততঃ কয়েক হাজার লোকের বাতিক থাকে তাদের ভবিষ্যত জানার। এবং তারা মনে করেন যে, ভবিষ্যত জানার ফন্দিটা প্রাচ্যদেশের লোকেদেরই জানা আছে। কারণ তারা নাকি 'মিষ্টিক'। বিশেষকরে হিন্দুরা। হিন্দুরা সব মিষ্টিক, যোগ করে। তাদের ভবিষ্যত জানার সব কল-কব্জা জানা আছে। তাই তাদের পুঁথিপত্র পঠন ও বিক্রয় একটা বেশ বড় ব্যবসা এই প্যারিস শহরে।

হিন্দুদের নাম দিয়ে, সংস্কৃত শব্দ আউড়ে অনেক ফরাসী মহিলা এই প্যারিস শহরে দু পয়সা করে খাচ্ছেন, তা নিজের চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। তাদের মধ্যে অনেকেই সংবাদপত্রে বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন এই বলে যে, হিন্দু-বিজ্ঞান-সম্মত ভবিষ্যত একবার পরীক্ষা করে দেখুন। অদৃষ্ট সিদ্ধি হবেই। ভূত-ভবিষ্যত সব বলে দেওয়া হবে। শুধু হাত দেখে নয়, পরলোকের আত্মাদের ডেকে।

পরলোকের আত্মা ডাকার কাজে অনেক মহিলা 'মিডিয়মের' কাজ করেন। তার ওপর রয়েছে তাসের কাজ। কাঁচের বল দেখে ভবিষ্যত বলা, পেণ্ডুলাম ঝুলিয়ে ভবিষ্যত বা হারান জিনিষ খুঁজে বার করা, এসব ভেল্কিবাজিতে ফরাসীরাও কম যায় না। কারুর হয়ত ভালবাসার পাত্র হাত ছাড়া হয়েছে, সে ছুটল ভেল্কি খেলান মহিলার কাছে। অবশ্য শিক্ষিতরা সাধারণতঃ ছোটেনা। এই ভেল্কিবাজদের মধ্যে অনেকে আবার রোগ সারাবার কাজে হাত দেয়। তারা এই হাতুড়েগিরিতে প্রচুর পয়সা রোজগার করে। এই সব হাতুড়ে ডাক্তাররা অনেক সময় হিন্দু, তিব্বতী বা নিগ্রোদের মন্ত্র, ঝাড় ফুঁকের কারবার করেন। তারাও বেশ ভাল রোজগার করেন। কারণ প্যারিসের মতন বিরাট শহরে উজবুকের তো অভাব নেই।

ফরাসীদের বিবাহ

ইউরোপের অনেক দেশে বিবাহ উৎসবে উপস্থিত থেকে সামাজিক লোকাচার দেখেছি। তবে আমার জ্ঞান বড় বড় শহুরে সমাজেই সীমাবদ্ধ। প্যারিসের মতন বিরাট শহরে আমার ফরাসী বন্ধু-বান্ধবদের বিবাহ উৎসবে বহুবার উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের বিবাহ উৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য বেশী হয়নি। গ্রামের লোকেরা একটু রক্ষণশীল। তারা প্রথমে তাদের গ্রামবাসী বা স্বজাতি ছাড়া বাইরের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করতে চায়না। উপরন্তু গ্রামের বিবাহ উৎসব ও সহরের বিবাহ উৎসব এক নয়। কারুর অবসর নেই। সুতরাং শহরের বিবাহ উৎসব চলে মোটর গাড়ীর ছুটন্ত গতিতে। শহুরে জীবনে তাড়াতাড়ির তাগিদে বিবাহোৎসবে লোকাচার স্ত্রী-আচার ইত্যাদি সংক্ষেপে করতে হয়। গ্রামে কিন্তু তাড়াহুড়োর বালাই নেই। তারা এখনও ধীরে-সুস্থে বিবাহ উৎসব সাঙ্গ করে। পালন করে লোকাচার ও স্ত্রী-আচার।

এমনি একটি গ্রাম্য বিবাহ উৎসবে যোগদান করেছিলাম সপ্তাহ কয়েক আগে। দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সের দরদইন জেলায় গিয়েছিলাম এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে। ছেলে-মেয়ে দুজনেই দরদইন জেলার অধিবাসী। এদের দুজনের গ্রাম প্রায় পাশাপাশি। তাই বলে কিন্তু এদের বিবাহ তাদের গুরুজনেরা স্থির করেনি। বর ও কনে দুজনেই সাধারণ কর্মচারী, কেহই উচ্চ শিক্ষিত নয়। ছেলেটির বাবা নেই, মারা গেছে বছর তিনেক আগে। মেয়েটির মা আছে, বাবা নেই, মারা গেছে যুদ্ধে। ছেলেটির নাম গাবরিয়েল, ডাক নাম গাবি। বয়স পঁচিশ। কাজ করে প্যারিসের একটি বড় টায়ার কোম্পানীর অফিসে। এর কাজ ঘুরে বেড়ান ও সময়ে কর্তাদের গাড়ী চালান।

মাসে রোজগার করে আটশ' টাকা। এর নিজের একটি ছোট মোটর গাড়ী আছে। বাড়ীতে রয়েছে মা ও দুই ভাই। এক ভাই স্কুলে পড়ে। আরেক ভাই কারখানার সাকরেদ। তবে টেকনিসিয়ানের ডিগ্রী আছে। মা কাজ করে ব্রান্তোম বলে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের এক ধনী পরিবারের বাড়ীতে রাঁধুনির কাজ। পরিবারে সবাই খাটে সুতরাং সংসার প্রায় সচ্ছল।

কনের পক্ষে সংসারে মা ও মেয়ে। মেয়ে নার্স-এর কাজ করে মেরিগো শহরের এক সরকারি হাসপাতালে। নার্সের চাকরিতে মেয়েটি রোজগার করে মাসে ছয় শ' টাকা। মা কাজ করে এক কারখানায়। মেয়েটির নাম আনি। মেয়েটির বয়স একুশ। কনের সংসারও বেশ সচ্ছল। আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যেদিন বিবাহ নির্ধারিত হয়েছে তার আগের দিন গিয়ে ব্রান্তোম পৌঁছলাম। আগেই বলেছি ব্রান্তোম শুধু গ্রাম নয়, ছোট শহরও। বন্ধুবর ফ্রাঁসোয়া ও তার দাদা ফিলিপকে নিয়ে ছুটলাম সকালে মোটরের গতি বাড়িয়ে পনর মাইল দূরে সাঁ পিয়ের দ্য কো গ্রামের অভিমুখে। সাঁ পিয়ের দ্য কো গ্রামে ছেলের বাস। তার বাড়ীটা একতলা। বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখি বর সেজে-গুজে প্রস্তুত। কনেকে সাজান গোছাবার কাজ তখনও চলছে। ঠিক আমাদের দেশে কনেকে যেমন নতুন শাড়ী পরিয়ে গহনা পরিয়ে (এদের গহনার বালাই নেই) চুল বেঁধে, চন্দনাদি মাখিয়ে টিপ পরিয়ে সাজান হয়, ঠিক তেমনি করে তার সখীরা তাকে তখন সাজাচ্ছিল। কনের ঘরে গিয়ে দেখি কনে লেসওয়ালা সাদা পোষাক (বিবাহের বিশেষ পোষাক) পরে বসে আছে আর তার বান্ধবীরা তাকে সাজাচ্ছে। কেউ চুল বাঁধছে কেউ চোখে কাজল পরাচ্ছে কেউ ঠোঁটে লিপষ্টিক গালে পাউডার মাখাচ্ছে। এদের দেরী দেখে বর হাঁক দিচ্ছে, "কিগো কি হল। দেরী হয়ে যাচ্ছে। এগারটার সময়ে গ্রামের মিউনিসিপ্যাল অফিসে উপস্থিত হতে হবে।"

আমরা যখন গেছি তার খানিক আগে কনের মামা বাড়ীর এক-

দল লোক এসেছে। তারাই সাজ-গোজের ভার নিয়েছে। বেলা দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ীর লোক, আত্মীয়স্বজনের দল, বন্ধু বান্ধবের দল একে একে এসে উপস্থিত হতে লাগল। সবাই প্রথমে এসেই বলে দেখি একবার কনেকে। ঘরে ঢুকে যে যার উপহার কনের হাতে দিতে লাগল। এখানে দেখলাম উপহার দ্রব্যাদির মধ্যে অধিকাংশ হল নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্র। কেউ পোষাক বা গহনা নিয়ে আসেনি। কেউ দিয়েছে একটা রেডিও, কেউ কাপ-ডিস প্লেট, কেউ ঘড়ি, কেউ খেলনা। এদিকে বরের গলা শোনা যাচ্ছে, "তাড়াতাড়ি শেষ কর। নইলে মিউনিসিপ্যাল অফিসের পৌরপতি অপেক্ষা করবে না।"

আমরা এগারটা বাজার পনর মিনিট আগে যে যার গাড়ী হাঁকিয়ে পৌর-প্রতিষ্ঠানের অফিসে এসে হাজির। বরের বাড়ী থেকে গাড়ী ছাড়বার আগে প্রথমে বরের গাড়ী সাজান হল কনের সাদা পোষাকের কাপড় দিয়ে প্রজাপতির আকারে কাপড়ের প্রজাপতি দিয়ে। অবশ্য জবরজং করে নয়। শুধু গাড়ীর হাতল ও মাথায় কিছু অলঙ্কারের মতন ঝুলছিল।

গ্রামের পৌর-প্রতিষ্ঠানের অফিস ওই গ্রামের বিদ্যালয় ভবনে। পৌর-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার সহকারী হলেন গ্রামের এক বিত্তবান কৃষি। কনের হাত ধরে সামনে চলেছে কনের মামা। আর তার পেছনে বরের হাত ধরে চলেছে বরের এক পিসিমা। বর ও কনের মা আছেন সারিবদ্ধ শোভাযাত্রার পেছনে। বরের পর সার সার লাইনে আছে তার বন্ধুরা আর তাদের সাথে কনের বান্ধবীরা। এদের সবাই অবিবাহিত। বিবাহিতরা পেছনে। কারণ অবিবাহিত ছেলে মেয়েরা ওইভাবে অনেক সময়ে পরিচিত হয়। অবিবাহিত মেয়েরা সেজে-গুজে মাথায় ফুলের মালা হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে চলেছে। এটা কুসংস্কার কিনা জানি না। ওরা বলে যে, আইবুড়ো মেয়েরা বিবাহ শোভাযাত্রায় যাবার সুযোগ পেলে তাদের নাকি সহজে ও তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়।

স্কুল বাড়ীর ঘরে পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজ সুরু হল। শুধু ফ্রান্সে নয়, সমগ্র ইউরোপে আজকাল সর্বপ্রথমে বিবাহ হয় রেজিষ্ট্রি করে সরকারি আইনমতে তারপর হয় ধর্মীয় মতে। পৌর-পিতা সরকারি আইন কানুন পড়ে শোনালেন তারপর বললেন, বর অমুকের ছেলে কনে অমুকের সন্তান। তোমরা নিজেদের দায়িত্বে বিবাহ করছ। স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামী করবে ইত্যাদি। সরকারী পত্রে বর ও কনে সই করার পর বরের পক্ষে সাক্ষ্য দিল তার এক বন্ধু আর মেয়ের পক্ষে তার মামা। এই সরকারী কাগজের দুই কপি করে বর ও কনেকে দেওয়া হল। সরকারী রেজিষ্ট্রিমতে বিবাহ সাঙ্গ হতেই এরা আবার শোভাযাত্রা করে গেল গীর্জার দিকে। গীর্জাটা কাছেই। এরা ক্যাথলিক তাই ক্যাথলিক গীর্জায় সুরু হল ধর্মমতে বিবাহ। গীর্জায় গিয়ে দেখি গ্রামের কিছু লোক সেখানে বসে অপেক্ষা করছে। গীর্জার পুরোহিত বাইবেল পড়ে বর কনেকে শোনাতে লাগলেন। পুরোহিত বলে যে, রেজিষ্ট্রি বিবাহ আসল বিবাহ নয়। আসল হল গীর্জায় বিবাহ। বিবাহ সম্বন্ধে বাইবেলে কি বলা হয়েছে সে সব পড়ে শোনাবার পর পুরুত বল্লেন যে, বর এখন থেকে তোমার এই স্ত্রী হলো ধর্ম-পত্নী। সেখানে পুরুত-ঠাকুর দুজনের আঙটি নিয়ে গীর্জার গঙ্গা জলে (সাদা মদে) চুবিয়ে শুদ্ধ করে বরের আঙটি কনের আঙ্গুলে আর কনের আঙটি বরের আঙ্গুলে পরিয়ে দিল। তারপরে আবার সুরু হল গীর্জার আনুষ্ঠানিক আচার। পুরুত ঠাকুর তিনবার কি সাতবার বাইবেল নমস্কার করে মাথায় নিয়ে এবং এক পাত্র গঙ্গাজলে (এরা গঙ্গাজলের বদলে সাদা মদ ব্যবহার করে) সাদা বাতাসা ভিজিয়ে সেগুলো খেলেন। পাত্রগুলো খাঁটী সোনার। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে গীর্জার বিবাহ শেষ হল। যারা উপস্থিত ছিল সেখানে তাদের সবাইকে বাইবেল পাঠ করতে হয়েছে। যাক গীর্জার পাট চুকলো। এবার সুরু হল বিবাহোৎ-সবের আমোদ-আহ্লাদ। গীর্জার বাইরে বেরিয়ে দেখি কেউ ফুলের পাতা, চাল, কাগজের গুড়ো ছিটোচ্ছে। তারপর বন্ধুবান্ধব,

আত্মীয়-স্বজন এসে বর কনেকে চুম্বন আলিঙ্গনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, কেউ বা ছবি তুলছে। বর বললে চল এবার ষ্টুডিওতে ছবি তোলা যাক সবার। সেখান থেকে মাইল দশেক দূরে নত্রঁ নামে এক শহরের ষ্টুডিওতে গিয়ে প্রথমে বর কনের ছবি ও পরে কনের বান্ধবদের ছবি তোলা হল। ইতিমধ্যে কনের সাদা পোষাকের একাংশ ছিঁড়ে ছোট ছোট প্রজাপতির আকারে অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের জামায় আটকে দেওয়া হ'ল। ওটা নাকি শুভচিহ্ন, এক বছরের মধ্যেই নাকি ওদের বিবাহ হবে। এমনি এদের ধারণা। এই প্রজাপতি সংগ্রহে আইবুড়ো ছেলে ও মেয়েদের আগ্রহই বেশী দেখলাম। তাদেরই উৎসাহ বেশী! বিবাহিতারা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তাদের মুখে যেন বেশী সাড়া নেই। কারণ তারা ভুক্তভোগী। গ্রামের মধ্যে দিয়ে যখন গাড়ী চালিয়ে আমরা চলেছি তখন গ্রামের ছেলে ছোকরারা বর-কনেকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল এই 'ভিব্ লে মারিয়ে' বা বিবাহিত নবদম্পতির জয় হোক, আরও অনেক কিছু বলে। এই গ্রীষ্মের দুপুর বেলা দৌড়-ঝাঁপ করে আমার তখন পেটে ছুঁচোর ডনবৈঠক শুরু হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম বরকে, কি হে এই ছবি তুলিয়ে আমাদের বিদায় দেবে নাকি! সে বলে আরে না না। এখুনি গাড়ী ছোটাব। বেলা একটার সময়ে পৌঁছলাম বরের গ্রামের কাছে আরেকটি ছোট শহরে। সেখানে এক রেস্তোরাঁয় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। বরযাত্রীদের জন্যে একটি ঘর সাজান। টেবিলে দেখি শুধু খাবার আর খাবার। তার আগে শুরু হল ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা। অবশ্য পানাদি করে পেটে খিদে বাড়িয়ে আমরা যখন টেবিলে বসলাম তখন বেলা দেড়টা। দুই বিরাট টেবিল পাতা। এক টেবিলে বর-কনে আর তাদের বন্ধু-বান্ধব। আরেক টেবিলে বয়স্কদের সাথে বর-কনের গুরুজনেরা। খাচ্ছি তো খাচ্ছি, খেয়েই চলেছি। একটার পর একটা পদ আসছে। রেস্তোরাঁর পরিচারক ও মালিক এসে বলছে এটা খান, এ হল পেরিগো জেলার শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

এটা পান করুন। এই করে বেলা গড়িয়ে চল্‌ল। মাঝে মাঝে হচ্ছে সঙ্গীত চর্চা। কনে পক্ষের মেয়েরা এনেছে গানের বই। একজন গান ধরে তো আমাদের তার তাল দিতে হয়। তারপর গ্রামের কিছু বুড়িরা ধরল বিয়ের গান। কেউ শুরু করল ওই জেলার ভাষায় গান। একজন শুরু করে তো তার শেষ হতে না হতে আরেকজনের গান। আর তার মাঝে মাঝে চলছে বর-কনেকে নিয়ে হাসি তামাসা। কত আর খাব। পেট তো আর লেটার বক্‌স নয়। শেষে এলো বিয়ের কেক্। এ কেক শহুরে সাদা কেক নয়। গ্রাম্য কেক কিন্তু অতি সুস্বাদু। সেই কেক কাটা ও তার ভাগ সবার পাতে পড়তে লাগল। বেলা তখন পাঁচটা যখন মধ্যাহ্ন শেষ হল। এর পরে অতিরিক্ত পানে কেউ চেয়ারে নিচ্ছে বিশ্রাম। আর বুড়োর দল গেল তাদের গৃহে বিশ্রাম করতে। ছেলে ছোকরার দল কি থাকে শান্ত। তারা ছুটল নাচতে। ওই ছোট শহরে নাচবার একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল সেখানে এসে সবাই উপস্থিত। বাদ্য ও বাদ্যকার নেই। তাই ছেলের দল গ্রামাফোন সহযোগে রেকর্ড বাজিয়ে নাচ শুরু করল। সে নাচ কি থামে। আমরা চললাম বিশ্রাম করতে। বর-কনে এসে হাত জোড় করে বলল সন্ধ্যে সাতটায় কিন্তু আবার আসা চাই। কারণ রাতের ডিনার শুরু হবে ওই রেস্তোরাঁয় আটটায়, তারপর খাওয়ার পর শুরু হবে নাচ। আমরা বাধ্য হয়ে আবার রাত্রে এলাম খেতে। খাওয়া শেষ হতেই ছেলে-মেয়ের দল ছুটলো নাচতে। এবার শুধু এরাই নয়, এসেছে গ্রামের অসংখ্য অধিবাসী। গ্রামের ছেলে-মেয়ের দল এসেছে নাচতে। নাচ চলল রাত একটা পর্যন্ত। আমরা তখন হাই তুলছি। এদিকে বরকর্তা বলছে নাচ শেষ করে যে যার ঘরে যাবে। কিন্তু কোথায় কে থামছে? বাইরে গিয়ে দেখি বরের গাড়ীর সামনে চার পাঁচটি গাড়ী আটকে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য বর-কনেকে আটকে রাখা হবে, ওদের পালাতে দেওয়া হবে না। বর-কনে শুধু সুযোগ খুঁজছে কখন পালাবে কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও গ্রামবাসীরা তাদের ওপর কড়া নজর রেখে দিলে।

রাত আড়াইটার সময় বর ও কনে কোন এক ফাঁকে পালিয়ে গেছে তাদের গাড়ী নিয়ে। তারা প্রথমে উধাও হয় তাদের গ্রামে। সেখানে তারা রাত কাটিয়ে তার পরের দিন সকালে চলে যায় মধুচন্দ্রিমা যাপনে দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলে। সপ্তাহখানেক পরে তাদের সাথে দেখা। দেখি তারা সুখী পরিবার। দু'জনেই কাজ করছে, করছে রোজগার ও সেই সাথে সংসার পালন।

* * * *

ফ্রান্সের 'ন্যাশনাল ডেমোগ্রাফি ইনষ্টিটিয়্যুট' বা জাতীয় লোকবল পরিষদ তাদের এক তথ্যবহুল পুস্তিকায় বলেছে যে, বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিতদের পরমায়ু কম। বিবাহিতেরা বাঁচে বেশী দিন। বিগত একশত বছরের ফরাসী সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে পরিষদ বলেছে, একশ' বছর আগে ফরাসীরা বেশী বয়সে বিয়ে করত, এখন তারা কম বয়সে বিয়ে করছে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে বিশ বছরের নিচে বিবাহিত মহিলার সংখ্যা একশ বছর আগে ছিল ১৫-৯ শতাংশ আর বর্তমানে তা হচ্ছে ২৮-৭ শতাংশ। অর্থাৎ বাড়ছে। গবেষকরা বলেছে যে, বিবাহটা শুধু হৃদয় বা মনের ব্যাপার নয়। আর্থিক প্রভাবই বেশী। কারণ আগের চেয়ে এখন আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল বলেই ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সে বিয়ে করছে। আগে তা সম্ভব ছিল না।

আরও বলা হয়েছে যে, ফ্রান্সে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনায়াসে বিয়ে করতে পারে। মেয়েদের শতকরা আটজন থাকে চিরকুমারী, সে ক্ষেত্রে পুরুষদের বেলায় থাকে শতকরা ৯-৫ জন চিরকুমার। এই দিক দিয়ে ফ্রান্স ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে ভাগ্যবান। ইংলণ্ডে অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা ফ্রান্সের দ্বিগুণ। অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি ও পর্তুগালে অবিবাহিতদের সংখ্যা ফ্রান্সের চেয়ে বেশী। যে ক্ষেত্রে ফ্রান্সে শতকরা নয়জন অবিবাহিত, সেখানে নরওয়ের অবিবাহিতের সংখ্যা শতকরা ১৮ শতাংশ; সুইডেনে ১৭ শতাংশ। কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবিবাহিতদের সংখ্যা সবচেয়ে কম। অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা ৩-৮ শতাংশ আর চিরকুমারদের সংখ্যা আট শতাংশ।

ফরাসী মহিলাদের 'মন সমীক্ষা'

প্যারিসের বিখ্যাত মহিলা সাপ্তাহিক 'এল' পত্রিকা একালের ফরাসী কিশোরী ও যুবতীদের মনের কথা প্রকাশ করেছে। 'এল' পত্রিকা আধুনিক কালের সমস্যা নিয়ে আশীটি প্রশ্নের এক ফিরিস্তি পাঠিয়েছিল অল্পবয়স্কা মেয়েদের কাছে। তার মধ্যে বিশ হাজার মেয়ে যে উত্তর দিয়েছে তার সারমর্ম দেওয়া গেল। এই বিশ হাজার মেয়ের বয়স ছিল পনর থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত। তার মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল সাড়ে আঠার বছরের। সবচেয়ে বেশী বয়সের ছিল চব্বিশ আর কম বয়সের সাড়ে চৌদ্দ। তাদের মধ্যে শতকরা ৮৫% জনই বাপ-মায়ের সাথে বাস করে, ৭৫% জনের নিজস্ব এবং পৃথক শোবার ঘর আছে এবং ৬৪% জন নিজের ঘর পরিষ্কার ও দেখাশোনা করে থাকে। ৫৪.৫% জন ছাত্রী, ৪৪% জন চাকরী করে, ১.৫% জন কিছুই করে না। ৫৫.৫% জন আই-এর প্রথম বার্ষিকীতে, ১৪% জন বি-এ, ক্লাসের ছাত্রী ১৪% জন কোনো কার্যকরী শিক্ষায়, ১০% জন ডাক্তারি বা কোনো পেশা শিক্ষায়। এদের মধ্যে ৮৪% জন নিজের পোষাক নিজে পরিষ্কার করে, ৭৪% জন রান্নাবান্না জানে, ৬০% জন বুননের কাজ জানে, ৬৯% জন সেলাই-এর কাজ জানে, ২৪% জন নিজের পোষাক নিজেই তৈরী করে।

নারীর সৌন্দর্যকে রমণীয় করে তোলাই সব মেয়ের উদ্দেশ্য যদিও তা হলেও, তাদের মধ্যে মাত্র ১৭% জন তাদের ওজন বা মেদ-বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন। প্রশ্ন ছিল সৌন্দর্য চর্চায় কার ওপর বেশী আরোপ করা হয়। তার উত্তরে বলেছে যে, মুখের ওপর ৫৫% আঙ্গুলের, উপর ৫২%, চোখের ৪৬%, চামড়া ৩৮%। শরীরের কোন অংশের

ওপর বেশী নজর দেওয়া হয় ? তার উত্তরে বলেছে, ওজনের ওপর ৩৭%, চামড়ার ওপর ২৪%, পায়ের ওপর ২২%, নাক ১৯%, স্তন ১৮%, দৈর্ঘ্যে ১৫%, চুল ১৪%, দাঁত ১১%, হাত ৯%। মেদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যারা নজর দেয় তারা হল শতকরা ২৭%, ব্যায়াম করে নিয়মিত ২৬%।

কে কোন ধরণের চিত্রতারকা, গায়ক পছন্দ করে তার ইতিবৃত্ত অনাবশ্যক এই কারণে যে সেগুলো সবই ফরাসী। যা বাঙ্গালী পাঠকের অজানা। তবে কার কোন গ্রন্থকার বেশী পছন্দসই তার উত্তরে বলেছে, আলবেয়ার কামু ৮.৫%, কলেত্ ৫%, সাঁ এক্সুপেরি ৫%, জ' পল সার্তর ৩.৫%, এমিল জোলা ৩%, ভিক্তর উগো ৩%, পাল´বাক্ ২%, অঁরি ত্রোইয়া ২%। আরেকটি প্রশ্ন ছিল বিখ্যাত বা নামজাদা মহিলাদের মধ্যে কাকে আপনি বেশী পছন্দ করেন। তার উত্তরে বলেছে, রাজকুমারী গ্রেস অব মোনাকো (যিনি আগে ছিলেন আমেরিকান ফিল্ম তারকা বলে পরিচিত গ্রেস কেলি) ৯% জন, মাদাম মারি কুরি ৮.৫%, লেখিকা জর্জসাঁদ ৭%, লেখিকা সিমন গু ব্যভোয়ার ২%, স্কারলেট ওহারা ২%, ফলেত ২%, হেলেন বুসের ১%, জোয়ান অব আর্ক ১%।

আরেক প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের বাপ-মায়ের কথা শোনে কিনা। তার উত্তরে বলেছে হ্যাঁ ৭০% জন, শতকরা ৭২% জন, পিতা-মাতা তাদের পকেট খরচা দেয়। শিক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মেয়েদের ছেলেদের মতন একই ধরণের লেখাপড়া করা উচিত কিনা, মাত্র ৩২% জন বলেছে হ্যাঁ। আপনাদের যেমন বাপ-মা মানুষ করেছে ঠিক তেমনি ভাবে কি আপনারা আপনাদের সন্তানদের মানুষ করবেন ? তার উত্তরে বলেছে ৪৪% জন হ্যাঁ। সন্তানদের কাছে সব খুলে বলা কি উচিত, তার উত্তরে ৯২% জন বলেছে হ্যাঁ।

এদের মধ্যে ৭৩% জন নিয়মিত দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করে,

৫০% জন টেলিভিশিয়ান দেখে, ৪২% জনের নিজস্ব ট্রানজিষ্টার রেডিও সেট আছে, ৬৩% জন আন্তর্জাতিক খবর রাখে। এদের জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন ধরণের কাজ এদের পছন্দসই। তার উত্তরে বলেছে ৯% জন গৃহিণীর কাজ, ৮% জন নার্সের কাজ, ৬.৫% জন অভিনয়, ৬% জন ডাক্তার, ৬% শিক্ষিকার কাজ, ৫% মডেল, ৫% ঘর সাজানোর কাজ, ৪% জন অনুবাদিকার কাজ, ৪% জন সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ, ৩.৫% জন সাংবাদিকদের কাজ, মাত্র ২% জন কেরাণী টাইপিষ্টের কাজ (ইউরোপের অধিকাংশ মেয়েরাই এই কাজ করে থাকে)।

এবার মেয়েদের আসল সমস্যায় আসা যাক। বিবাহ সম্পর্কে যে যা উত্তর দিয়েছে তাই বলছি। আপনি কি বিবাহ করবেন? উত্তরে বলেছে হ্যাঁ, ৯৭% জন। কোন বয়সে? বাইশ বছর বয়সে। কোন বয়সের ছেলের সাথে? ছাব্বিশ বছরের ছেলের সাথে। সন্তান কামনা করেন কি? উত্তরে বলছে হ্যাঁ ৯৩% জন। বিবাহের পূর্বে মেয়েদের খাঁটি সতী থাকা উচিত কি? উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ, ৭৩% জন। ভালবাসার বিবাহ কি চিরস্থায়ী হয়? উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ ৬৯% জন। বিদেশীকে কি বিবাহ করবেন? উত্তরে বলেছে হ্যাঁ ৭১% জন। পিতা-মাতার অনিচ্ছা বা বাধা সত্ত্বেও কি কোনো ছেলেকে বিবাহ করবেন? উত্তরে বলেছে হ্যাঁ, ৯১% জন। ছেলেদের কোন্ কোন্ দোষ বরদাস্ত করেন না? স্বার্থপরতা ২০%, মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ান ১৫%, বালক-স্বভাব ১৫%, অকর্মণ্য ১৪%, পশু ১৩%, দুর্ভাবনার কারণ ১০%, বোকা ৮%, মুখচোরা ৫%। ছেলেদের কাছ থেকে কোন ধরণের প্রশংসা পছন্দ করেন। মেয়েটি ভাল স্ত্রী হবে ৩২%, মেয়েটি সুন্দরী ২৪%, ভাল ১৩%, মজার ১২% গুণসম্পন্ন ১১%, সাহসী ৭%। মেয়ের চেয়ে ছেলের সঙ্গ কি বেশী পছন্দ করেন? উত্তরে বলেছে হ্যাঁ ৭৩% জন। মন নিয়ে কি খেলা করেন? উত্তরে বলেছে হ্যাঁ ৬৯% জন। কেন? ভাল লাগে বলেছে ৩৭% জন, মজা পাই ২৯%, খেলার মতন ১৬%, কারুর

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা বলে ১১%, অন্যদের দেখাদেখি ৭% জন।

*　　　*　　　*　　　*

ট্রামে-বাসে বা ট্রেণে বিনা টিকিটে ভ্রমণ আমাদের কাছে নতুন কিছু না। তাতে নতুনত্ব নেই। কিন্তু এরোপ্লেনে চড়ে বিনা টিকেটে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করা গল্পকথা নয়! সত্যি ঘটনা। এ হল এ্যাডভেঞ্চার। পঁয়ত্রিশ বছরের এক রাশিয়ান, নাম তার স্টেফান স্ট্রগফ এই সপ্তাহখানেক হল বিনা টিকিটে প্যারিস থেকে টোকিও এবং টোকিও থেকে প্যারিস ভ্রমণ করে এলেন। অবশ্য আসবার সময় টোকিওর পুলিশ তাকে পত্রপাঠ বিমানে তুলে দিয়েছে। স্টেফান স্ট্রগফ সপ্তাহখানেক আগে প্যারিসের ওর্লি বিমানবন্দরে চুপিসাড়ে উঠে পড়ে টোকিওগামী এয়ার ফ্রান্স বিমানে। সে লুকিয়ে থাকে বিমানের মাল রাখার জায়গায়। সেখানে হিম শীতল ঠাণ্ডা। একদিন এই ঠাণ্ডায় না খেয়ে দেয়ে ছিল। তারপর টোকিও বিমানবন্দরে নেমে সে টোকিও দেখতে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়ে।

এর আঁগে স্ট্রগফ মস্কো থেকে পালিয়ে এসেছে বিনা টিকিটে বিমানে করে প্যারিসে। সেখান থেকে জাহাজে বিনা টিকিটে পালিয়েছে বৃটেনে। বিনা টিকেটে ওই বিমানে মালের জায়গায় লুকিয়ে গেছে নিউইয়র্কে। আবার গেছে জাহাজে করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে। সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করেছে মোটরগাড়ী থামিয়ে। এর একমাত্র কামনা দেশভ্রমণ। এখন তার একমাত্র ইচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটে জগৎটা দেখা। এরই মধ্যে তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছে দুখানা বই। দুখানাই প্যারিসে প্রকাশিত হয়েছে। এরই নাম এ্যাডভেঞ্চার।

*　　　*　　　*　　　*

কলকাতায় ফুটবল মরসুম আরম্ভ হল বলে। বাঙ্গালীর কাছে

ফুটবল যতখানি জনপ্রিয় ততখানি বোধহয় অন্য খেলা নয়। ফুটবলের টিম এগারজন খেলোয়াড়কে নিয়ে। এক এক ক্লাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খেলোয়াড় খেলে। কিন্তু ফুটবল খেলার ইতিহাসে নিদর্শন দেখিয়েছে একটি লুক্সেমবুর্গ পরিবার। লুক্সেমবুর্গ রাষ্ট্রের এশ শহরের একটি পরিবার নিজেদের ফুটবল টিম গড়েছে। বাবা এমিলের দশটি ছেলে সুতরাং ছেলেদের ও বাবাকে নিয়ে এগারজন খেলোয়াড়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স চৌদ্দ। এদের মধ্যে দু'জন ওখানকার খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়। একজন বক্সিং-এ নামজাদা, একজন সাইকেল প্রতিযোগিতায় নাম করেছে। ফুটবল টিমের নাম "মঁদ" বা জগৎ। এদের এই বাপ-ব্যাটার ফুটবল দল অন্য সব ফুটবল ক্লাবের সাথে খেলে প্রত্যেকটাতে জিতেছে। এদের এই ফুটবল খেলা দেখতে আগে মাঠে আসতো দুশো কি তিন শ' এখন আসছে দেড় হাজার করে। এতই জনপ্রিয় হয়েছে এদের দল। দলের রক্ষণা-বেক্ষণ করে ছেলেদের মা মাদাম সোফি। তিনি দলের জামা-কাপড় কাচা থেকে রান্নাবান্না সবই করে তাদের সাহায্য করেন। এ হল সম্পূর্ণ একটি পরিবারের নিজস্ব ফুটবল দল। জার্মাণীর ফ্রাঙ্কফুট সহরের একটি ফুটবল দল তাদের খেলাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওই দলটি এদের মতন নয়, তাদের দলে খুড়তুতো মামাতো ভাইয়েরা খেলে বলে লুক্সেমবুর্গের দল তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা চায় তাদের মতনই একটি পরিবারের ফুটবল দলের সাথে ম্যাচ খেলতে। অমন দল সহজলভ্য নয়।

ফরাসী 'মধ্যবিত্ত সমাজ'

ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানীরা ইদানীংকালে ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন, তারই ইতিবৃত্ত জানা গেল তথ্যানুসন্ধান থেকে। দেখা যাচ্ছে প্রায় সব দেশে মধ্যবিত্তদের সমস্যা প্রায় এক প্রকার। যাদের বহিঃসৌষ্ঠব বজায় রাখতে গিয়ে হয় এক বেলা মাংস বা মাছ কমাতে হয় কিম্বা ডালে নুনের মাত্রা বাড়িয়ে খরচ কমাতে হয়, ফরাসীদের বেলায় তা ব্যতিক্রম নয়। তবে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের সাথে ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক পর্যায়ে তুলনা চলে না। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, প্যারিসের একটি ঝাড়ুদার বা ভৃত্য মাসে রোজগার করে সাড়ে তিনশ থেকে পাঁচশ টাকা। সেই অনুপাতে বিচার্য।

ফ্রান্সে জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। পাঁচ কোটির মধ্যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মাসে রোজগার করে এক হাজার টাকা বা এক হাজার নয়া ফ্রাঙ্ক। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে এই এক কোটি ত্রিশ লাখ ফরাসী হল মধ্যবিত্ত। এরা একেবারে দরিদ্রও নয়, আবার ধনীও নয়। এক হাজার টাকার ওপর প্রতিটি পরিবার সমাজ বীমা মারফৎ পেয়ে থাকে প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধাদি। তার ওপর আছে বাস-ট্রাম-ট্রেণে অল্প মূল্যের টিকিট ও ছেলে-মেয়েদের প্রায় বিনা মূল্যের শিক্ষা। এত সত্ত্বেও সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করছে ফরাসী মধ্যবিত্তদের আয় গত দশ বছরে বেড়েছে না কমেছে? উত্তরে তারাই বলছে যে, ১৯৪৯ সালে মধ্যবিত্তদের আয় ছিল চারশ টাকা। ১৯৫৯ সালে সাতশ টাকা আর বর্তমানে এক হাজার। তবে কথা আছে, ১৯৪৯ সালে বাজার দর যা ছিল ১৯৫৯ সালে ঠিক সেই রকম ছিল না আবার তেমনি ১৯৬১ সালে বাজার

দর তেমনি নেই। একদিকে যেমন আয় বেড়েছে তেমনি বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম। তবে অনুসন্ধানকারীরা বলছে যে, ১৯৪৯ সালে যে মধ্যবিত্ত পরিবার মাথা পিছু ১০৫ গ্রাম মাংস খেত, এখন সেই পরিবার মাথাপিছু ১৫০ গ্রাম মাংস খায়। আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবার মাসে মাথা পিছু তেত্রিশ টাকার দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য খেয়ে থাকে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণীরা অনুযোগ করেছে এই বলে যে, জিনিসপত্রের দামের তুলনায় ঘর ভাড়া বেড়েছে শতকরা ১১৩ ভাগ। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় বলতে পারি খাদ্যদ্রব্যের দাম অন্তত পাঁচ বছরে দ্বিগুণ, কোনো কোনো স্থলে তিন-চার গুণ বেড়েছে। জামা কাপড়ের দাম তত বাড়েনি। তবে সেই সাথে নিয়মিত বাড়ছে প্রত্যেকের আয় বা মাহিনা।

সমাজবিজ্ঞানীরা সমস্যা খাড়া করেছে, সে হচ্ছে নিম্নরূপ। মঁঃ দুপঁ অবিবাহিত এবং মঁঃ দুবোয়া সংসারী, দুবোয়ার পাঁচটি সন্তান। এরা দুজনেই মাসে রোজগার করে পাঁচশ ষাট টাকা। মঁঃ দুপঁ অবিবাহিত তবে খরচ কম কিন্তু তাকে মাসে পঁচিশ টাকা করে আয়কর দিতে হয়, আর মঁঃ দুবোয়া আয়কর তো দেয়ই না বরং উল্টে সরকারের কাছ থেকে মাসে সাহায্য পায় চারশ ছেচল্লিশ টাকা। ফলে মঁঃ দুবোয়ার মাসিক আয় গিয়ে দাঁড়ায় এক হাজার টাকা। মনে রাখতে হবে যে, ফরাসী সরকার প্রতিটি পরিবারে সন্তানের মাথা পিছু আশী টাকা করে সাহায্য ভাতা দিয়ে থাকে। এত সত্ত্বেও অবিবাহিত মঁঃ দুপঁর আর্থিক অবস্থা মঁঃ দুবোয়ার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ মঁঃ দুবোয়ার পরিবার বড় ও তার প্রতিটির মাথা পিছু মাসে খরচ হয় দুশো চল্লিশ টাকা করে। মধ্যবিত্ত পরিবারে এইখানেই যত গণ্ডগোল। যার সংসারে লোক সংখ্যা যত কম তার খরচ তত কম অর্থাৎ তার জীবনযাত্রার মান তত উঁচুতে।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানীরা বৃদ্ধদের সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশন

করেছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তার কারণ অনেক বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা শেষ বয়সে বাস করে সমাজের অন্তরালে বৃদ্ধদের আবাসে। কোনো পরিবারে নয়। ফরাসী সরকারের সমাজ বীমা মারফৎ প্রতিটি বৃদ্ধ মাসে ভাতা পেয়ে থাকে গড়ে ষাট-সত্তর টাকা। পনর লক্ষ বৃদ্ধ মাসে পেয়ে থাকে ষাট টাকা ভাতা, দশ লক্ষ মাসে পায় নব্বুই টাকা আর বাকি দশ লক্ষ বৃদ্ধ মাসে পেয়ে থাকে নব্বুই টাকা। এই টাকায় প্রতিদিন মাছ মাংস খাওয়া চলে না। তাই অনেক বৃদ্ধ সপ্তাহে অনেক দিন শুধু দুধ-রুটি দিয়েই আহার সমাপ্ত করে থাকে। আমাদের দেশের সাথে এদের তুলনা করে লাভ নেই। আমরা কোথায় আছি তার উত্তর আমাদের জনগণই দিতে পারবেন।

*　　*　　*　　*

ফ্রান্সে ধনীদের বাস প্যারিস নগরীতে। ফরাসী সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তরের তথ্য থেকে জানা গেল যে, মাথা পিছু দুই হাজার পাঁচ শ থেকে ছয়শ টাকার আয় হয়ে থাকে মাসে প্যারিসে, তারপর হল ফ্রান্সের অন্যান্য জেলায়। যেমন আলজাস´, শ্যাম্পান, পিকার্ডি বা উত্তর ফ্রান্সে মাসিক আয় দুই হাজার তিনশ থেকে দুই হাজার সাড়ে চারশ টাকা। সব চেয়ে কম আয় হয়ে থাকে ব্রতাইন জেলায়, সেখানে মাথাপিছু এক হাজার আটশ টাকা। অর্থাৎ একটি দেশে অঞ্চল বুঝে আয়ের বহর বেড়ে থাকে। যেমন কলকাতায় মাথাপিছু আয় মালদহের ন্যায় নয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতীয় ও পূর্ব পাকিস্তান পার্বত্য জাতিদিগের বিবাহ-প্রথা

নাগা :

নাগাদের বাসস্থান আসামের নাগা পর্বতে। ইহারা পার্বত্য জাতি। নাগাদিগের মধ্যে নানা শ্রেণী-বিভাগ বর্তমান। প্রত্যেক শ্রেণীর সহিত প্রত্যেক শ্রেণীর সংযোগ থাকিলেও কয়েকটি শ্রেণীর বিবাহ-প্রথার পার্থক্য আছে। মূল নাগারা জাতিতে মঙ্গোলীয় শ্রেণীর; ইহাদিগের ভাষা ইন্দো-চৈনিক। নাগারা নানা দেব-দেবীর পূজা করে।

নাগাদিগের মধ্যে বিবাহের উপযুক্ত বয়স্ক হইলেই তাহার বিবাহ হয় না; বিবাহের উপযুক্ত হইলে ছেলের নিজের অর্থ উপার্জন করিবার এবং নিজ বাসস্থান নির্মাণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাহি—তবে বিবাহ হইবে, নহিলে তাহার বিবাহ হইবে না। নাগাদিগের বিবাহ কখন নিজ পরিবারের মধ্যে হয় না। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ক্রয়ের রী'ত আছে। যে মূল্যের স্ত্রী স্বামী ঠিক সেই মূল্যের হইবে। নাগাদিগের মধ্যে দর নানা কারণে নানারূপ হয়। সুশ্রী, সুন্দর ও সুগঠিত কুমারীদিগের মূল্য, অসুন্দর ও দুর্বল কুমারীর মূল্য অপেক্ষা অধিক। ইহাদিগের মধ্যে ভালবাসা জন্মিলে বিবাহ হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ-নীতি প্রচলিত আছে। বিবাহের সময় বর কনেকে যৌতুক দেয়। নাগাদিগের মধ্যে যাহারা কুমার তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র শয়ন-ঘর থাকে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সম্পত্তির অধিকারী।

টংখুল নাগা :

পূর্বে নাগাদিগের বিবাহ-প্রথা যাহা বলা হইয়াছে, ইহাদিগের বিষয়েও তাহাই। বিবাহ প্রথায় কোন পার্থক্য নাই।

উচ্চ আসামের নাগা :

ইহাদিগের বাসস্থান উচ্চ আসামের পার্বত্য অঞ্চলে। ইহাদিগের পুরুষরা স্ত্রীলোক অপেক্ষা উত্তমরূপে অঙ্গাবৃত করিয়া কাপড় পরে। যে বিবাহের উপযুক্ত সে কন্যাপক্ষকে দেখাইবে, সে বিবাহের উপযুক্ত এবং বিবাহের পর পরিবার ভরণপোষণে সমর্থ। বিবাহের পূর্বে ভাবী জামাতাকে ভাবী শ্বশুরের ঘরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাটিতে হইবে ও তথায় কিছুদিন বাস করিতে হইবে। যখন বিবাহের সময় উপস্থিত হইবে তখন জামাই মুখে নানা রঙ মাখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া নানা শ্রমসাধ্য কাজ করিবে। ইহাদিগের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ রীতি আছে। ইহারা যখন যাহাকে বিবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করে তখন সে তাহার স্ত্রীকে কোন এক স্থানে লইয়া যাইয়া শাস্তি দেয় এবং অন্য কোন স্ত্রীর সহিত বাস করে।

গারো :

গারোদিগের বাস মৈমনসিংহের উত্তরে আসামের গারো পর্বতে। ইহারা শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ, কর্মক্ষম জাতি। ইহারা জঙ্গল সাফ করিয়া চাষ ও বাস করে। ইহাদিগের পুরুষ ও নারীদিগের সাজসজ্জার কোন বালাই নাই। নারীরা কোমরে ডোরাকাটা সূতা এবং পুরুষরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া থাকে। বিবাহের পূর্বে মেয়েরাই প্রথমে ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিবে, নহিলে তাহার শাস্তি হইবে। বিবাহের কথা প্রথমে স্ত্রীজাতির নিকট হইতেই আসে। ইহাদিগের মধ্যে ভালবাসার ফলে বিবাহ প্রচলিত আছে।

জননীর সহিত সম্পর্ক আছে, এরূপ মেয়েকে গারোরা বিবাহ করে না।

যাহারা সর্দারের মত, তাহাদিগের বিবাহ ঐরূপ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে হয়। বিবাহের সময় পুরোহিত ভগবানের কাছে নানারূপ মিনতি করিয়া নব-দম্পতির জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করে।

ইহাদিগের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ নীতি আছে। তবে তাহারা হঠাৎ তাহা করে না ; কারণ, তাহারা উহা পছন্দ করে না।

কুকি :

ইহাদিগের বাস লুসাই পর্বতে। ইহারা পার্বত্য জাতি, নাগা ও গারোদিগেরই মত অসভ্য। যে ছেলে যখন বিবাহের উপযুক্ত হয়, সে তখন তাহার বন্ধুকে মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়া দেয়। বন্ধুরা মেয়ে পছন্দ করিলে ছেলের বাবা কথা পাকা করিতে যায়। কথা পাকা হইয়া গেলে ছেলের বাবা জিনিসপত্র দিয়া মেয়ে কিনিয়া আনে—অর্থ দিয়া নহে। কন্যা কিনিতে অন্ততঃ ৩০ টাকা ব্যয় হয়। কনে কিনিবার অর্থ না থাকিলে বর কনের বাবার কাছে চাকরী করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্বশুর বাড়ী বাস করে। ইহাদিগের বিবাহ নিজের পরিবারের মধ্যে হয় না। বিবাহের দিন পুরোহিত তাহাদিগকে এক অদ্ভুত তরল পদার্থ পান করাইয়া দেয় এবং নব-দম্পতির মঙ্গল কামনা করিয়া মন্ত্র পড়ে। তখন সে তাহাদিগের দুই জনের মাথায় চিরুণি গুঁজিয়া দেয় ; সেই চিরুণি মৃত্যুর পর কবরে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাদিগের ভালবাসার বিবাহ-প্রথা আছে। বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ হয় কিন্তু কোন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে না। বিবাহ-বিচ্ছেদ নীতি ইহাদিগের মধ্যেও আছে ; যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, তবে স্ত্রী তাহার বিবাহের যৌতুক ফিরিয়া পায়। কোন স্ত্রীর সন্তান থাকিলে সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। পুরুষেরও সেই ব্যবস্থা। ইহাদিগের মেয়েরা অধিক সন্তানের জননী হইতে ভালবাসে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা এক বৎসর কবরের উপর বসে।

চাক্‌মা :

বিবাহের উপযুক্ত হইলে চাক্‌মা ছেলের বাবা অন্য লোক দিয়া মেয়ে দেখিয়া সম্বন্ধ ঠিক করে। প্রথম পাকা দেখার সময় ছেলের বাবা এক বোতল মদ লইয়া মেয়ের বাড়ী যায়। দ্বিতীয় দিনেও সে তাহাই করে। তৃতীয় দিনে সে মুরগী ও ভাতের পিষ্টক লইয়া

ায় ও বিবাহের তারিখ ঠিক করে। ইহাদিগের মধ্যে ২৫ বৎসরের অবিবাহিত অতি অল্পই দেখা যায়। আত্মীয়দিগের মধ্যে বিবাহ হয় না। যদি কেহ নিজের আত্মীয়ের মধ্যে ভালবাসায় পড়ে তবে তাহার ৫০ টাকা জরিমানা হয়; উপরন্তু শাস্তি ভোগ করিতেও হয়। কনে কিনিয়া বিবাহ করিতে হয়। বর বিবাহের সময় কনের বাড়ী যাইয়া কনের বাবাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া কনে নিজের বাড়ী লইয়া আসে। বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া শকুন দেখিতে ও শকুনের গন্ধ ভাল করিয়া শুঁকিতে হয়। বিবাহের সময় বর কনেকে সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা ইহাদিগের মধ্যে আছে। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ অতি অল্পই হয়।

খ্যংথা :

ইহাদিগের বাস চট্টগ্রামের পর্বতে। ইহাদিগের অনেকে আবার পর্বতের উচ্চস্থানে বাস করে। ইহাদিগের ভাষা আরাকানিজ —ধর্ম বৌদ্ধ। ইহাদিগের মড়া পুড়াইয়া ফেলা হয়। ইহারা চাষ করিয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহ অতি অল্প বয়সে হয়। স্ত্রীদিগের ব্যবহারে পুরুষেরা তাহাদিগের ভালবাসা হারায়। স্ত্রীদিগের আধিপত্যই অধিক। মেয়েরা পুরুষদিগকে নানারূপ আদেশ করে এবং পুরুষেরা স্ত্রৈণ হইয়া থাকে। বিবাহের সময় গারোদিগের মত পুরোহিত বিড় বিড় করিয়া নব-বিবাহিত দম্পতির মঙ্গলের জন্য মন্ত্র পড়ে।

টংথা :

ইহাদিগের বাসস্থান চট্টগ্রামের টং পাহাড়ে। ইহারা খ্যংথা অপেক্ষা বেশী হিংস্র। রং কাল। বাস অতি দুর্গম স্থানে। ইহারা ভূমগুলীয়কে পূজা করে। অনেক সময় টংথা মেয়েরা ব্যভিচারিণী হয় এবং সেই উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এইভাবে তাহারা অনেক সময় বিবাহ করে। ত্রিশ বৎসর-এর অধিক কুমার অথবা কুমারী দেখা যায় না। ইহাদিগের মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা

আছে; বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় স্বামী স্ত্রীকে কোন নির্জন স্থানে লইয়া যাইয়া শাস্তি দেয়।

কাছারী:

কাছারীদিগের বাস আসামের কাছাড়ে। ব্রহ্মপুত্র ও আসাম উপত্যকায় ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহারা হিন্দু হইলেও গো মাংস ও শূকরের মাংস আহার করে। ইহাদিগের বিবাহ নিজ জাতির মধ্যে হয়। বিবাহের বন্দোবস্ত পাত্রের পিতামাতা এবং বন্ধু-বান্ধবরাও করেন। বিবাহের পূর্বে বর তাহার বন্ধুবান্ধব লইয়া ভাবী স্ত্রীর বাড়ীতে যায় এবং তথায় পাত্রী-পক্ষের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ হয় এবং বর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভাবী স্ত্রীকে যৌতুক দিয়া বিবাহ করিতে লইয়া আসে। ইহাদিগের মধ্যে ভালবাসার বিবাহ প্রচলিত আছে। দেখচাং নামক এক বাড়ীতে ইহাদিগের ভালবাসার সূত্রপাত হয়। কোন যুবক যদি কোন তরুণীকে ভালবাসিয়া ফেলে এবং বিবাহে সম্মত না হয়, তবে ছেলে সেই মেয়েকে লইয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই জন্য পাত্রীর পিতা সেই ছেলেকে পাঁচ টাকা জরিমানা করে এবং বিবাহে যে টাকা যৌতুক দিতে হয়, তাহা হইতে অধিক টাকা জরিমানাস্বরূপ দিতে হয়। যদি কোন ছেলের পাত্রী কিনিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে তাহাকে মেয়ের বাড়ীতে থাকিয়া যতদিন পর্যন্ত না সে টাকা শোধ হয় ততদিন চাকরী করিতে হয়। যদি টাকা শোধ করিতে না পারে এবং যদি কোন সন্তান জন্মায় তবে তাহাকে সেই পরিবারে চিরকালের জন্য থাকিয়া যাইতে হয়। বিপত্নীক তাহার স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু বড় বোনকে নহে। বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু ভাসুরকে নহে। কাছারীদিগের বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীতে পানপাতা অদল-বদল করে। একাধিক বিবাহ-প্রথা ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। কোন সন্তান না থাকিলে সে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যেও বিবাহ বিচ্ছেদনীতি প্রচলিত আছে। বিনা কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে হইলে

অনেক বেগ পাইতে হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ করিলে স্ত্রী তাহার বিবাহের যৌতুক সমস্ত ফিরিয়া পায়।

মণিপুরি :

ইহাদিগের পরিচয় বিশেষ দিতে হইবে না। ইহারা সকলেই হিন্দু, চৈতন্যভক্ত। মণিপুরিদিগেব মধ্যে আবার অনেক বৌদ্ধও আছে। ইহারা পূর্বেকার পার্বত্য জাতীয় হইতে অনেক পরিমাণে সভ্য। মণিপুরি মেয়েরা স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে নানা রকম ব্যায়াম করে। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ব্যায়াম করে। মণিপুরি মেয়েরা অপর যে কোন পুরুষের সহিত সহবাস করিতে পারে। ইহাদিগের বিবাহ নিজের আত্মীয় এবং অন্য জাতির সঙ্গেও হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদনীতি ইহাদিগের মধ্যেও আছে। স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করার সময় তাহাকে ত্যাগ করার কারণ দেখাইতে হইবে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রী একখানা পানপাত্র ও তাহার কটিদেশের কাপড় ছাড়া তাহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়া পায়। (৩)

ত্রিপুরা :

পার্বত্য ত্রিপুরায় ইহাদিগের বাস। ইহারা প্রকৃতির পূজা করে। ইহারা অত্যন্ত সত্যবাদী এবং সরল। ইহাদিগের মধ্যে কনে কিনিবার প্রথা আছে। বর যৌতুক দিয়া কনে ক্রয় করে। যদি ছেলে কনেকে যৌতুক দিতে না পারে তবে কনের পিতার কাছে অর্থাৎ ভাবী শ্বশুরের কাছে চাকরী করিবে। ইহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অতি অল্পই হয়। স্ত্রী বর্তমান থাকিতে অপর পত্নী গ্রহণ অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাদিগের বিবাহের সময় কোন ধর্ম উৎসবের প্রয়োজন হয় না। কুমারী মেয়েরা যুবকদিগের সঙ্গে মিশিতে পারে ; কিন্তু সহবাস করিতে পারে না। অবিবাহিতদিগের কোন সামাজিক বা অন্য কাজে ডাকা হয় না। মেয়েরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করে। বিবাহের সময় কনের মা তাহার মেয়েকে এক পাত্রে এক অদ্ভুত তরল পদার্থ দেয়। কনে বরের হাঁটুর উপর বসিয়া অর্ধেক পান করিয়া স্বামীকে পান করিতে দেয়।

ছেলের জন্য মেয়ে দেখিতে পাঠায়। মেয়েকে ভালরূপে পরীক্ষা করা হয়, যেন সে বিবাহের পরে ভালরূপে সংসারের কাজ করিতে পারে। বিবাহের দিন নির্ধারিত হইলে, ছেলের পিতা মেয়ের বাড়ীতে যায়। বর বিবাহের সময় কনের বাড়ীতে যাইলে কনের আত্মীয়েরা বাধা দেয় এবং সেই বাধা জয় করিলে সে সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে পারে, নচেৎ নহে। এই ভাবে বরকে কনের পক্ষ হইতে সাত বার বাধা দেওয়া হইয়া থাকে এবং বরকে কনে গ্রহণ করিতে প্রত্যেক বার জয়ী হইতে হয়। বিবাহের দিন কনের বাড়ীতে একটি মুরগী গলা কাটিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়—ইহা নব-দম্পতির মঙ্গলের জন্য। বিবাহের সময় বর এবং কনের ডান ও বাঁ হাত মিলাইয়া মিলাইয়া পুরোহিত তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য জল দিয়া মন্ত্র পড়ে। বিবাহের দিন বরের পিতা-মাতা কনের বাড়ীতে শয়ন করে। সেই দিন দুইপক্ষের পিতামাতা মিলিয়া মদ মাংস মহানন্দে ভক্ষণ করে। বর কনেকে এক পাত্রে ভাত খাওয়ান হয় ও মদ পান করান হয়। মাঠে বাঁশের মাচায় নানা ফুল দিয়া সাজাইয়া বর কনেকে বসান হয়। গ্রামের নরনারী তাহাদিগকে দেখিতে আসে এবং সেই সব দর্শকদিগের ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। বিবাহ উৎসবে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও করা হয়। অনেক সময় কন্যাপক্ষের হাসিঠাট্টার চোটে বরকে নাকাল হইতে হয়। বিধবা বিবাহ-প্রথা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রথমা পত্নী অন্যান্যদিগের তুলনায় স্বামীর নিকট কিছু অধিক সুযোগ পায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ নীতি ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে গেলে উভয়কে গ্রামের পঞ্চায়েতের নিকট তাহাদিগের অভিযোগ জানাইতে হয়। পঞ্চায়েত অনুমতি দিলে তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদকারিণীদিগের পুনরায় বিধবাদিগের মত বিবাহ হয়। মগদিগের মধ্যে কনে কিনিবার রীতি আছে। কনের দাম ৩০ হইতে ৮০ টাকা পর্যন্ত হয়। এক বংশের মধ্যে বিবাহ হয় না।

খাসিয়া :

খাসিয়াদিগের বাসস্থান আসামের খাসিয়া পর্বতে। ইহারা প্যার্বত্য জাতি। ছোট ছোট দলে বাস করে। এক এক জন সর্দার এক এক দলে থাকে। মাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (মামা) সংসারের কর্তা হয়। পিতা মামার (শালার) অধীন সংসারে থাকে। যখন মামা এবং পিতা শিকার অথবা অন্য কাজে বনে যায় তখন মাতা সংসারে কর্তা হয়। ইহাদিগের বিবাহ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে হয় না। মামা এবং পিসীমা জীবিত থাকিতে তাহাদিগের মেয়েদের সহিত বিবাহ হয় না; কিন্তু তাহাদিগের মৃত্যুর পর বিবাহ হয়। খাসিয়ারা নিজের পছন্দ মত বিবাহ করিয়া থাকে। মার্চ মাসে পূর্ণিমায় কুমারীরা হাত ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলে অবিবাহিত ছেলেরা সে স্থানে যায় এবং সেই হইতে তাহাদিগের বিবাহের সূত্রপাত হয়। বিবাহ-বাসরে স্ত্রী-স্বামীর আঙুলে তাহার আংটী পবাইয়া দেয় এবং স্বামী স্ত্রীর আঙুলে তাহার আংটী পরায়। বিবাহের দিন উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধব আসিলে এক মহা ভোজ দেওয়া হয়। পুরোহিত নবদম্পতির মঙ্গলের জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করে। বিবাহের পর বর শাশুড়ীর বাড়ীতে থাকে এবং সেখানেই তাহাদিগের সন্তান হয়। নিজ বাসস্থানে তাহারা অতি অল্পই স্ত্রীকে রাখে। খাসিয়া মেয়েরা অনেক সময় একাধিক পতি গ্রহণ করে। এই প্রথা দরিদ্রদিগের মধ্যে অতি সামান্য কখনো, দেখা যায়। ইহাদিগের বিবাহ-বিচ্ছেদের নীতি প্রচলিত আছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে উভয় পক্ষের মত থাকা চাই। কিন্তু দুই জনে পুনরায় বিবাহ হয় না।

মিকির :

মিকিরদিগের বাস আসামের পার্বত্য অঞ্চলে। ইহারা টিবেটো-বার্মা শ্রেণীভুক্ত এবং অর্ধসভ্য। ইহাদিগের বিবাহের বয়স চৌদ্দ হইতে পঁচিশ পর্যন্ত। সাধারণতঃ পুরুষদিগের আঠার হইতে উনিশ এবং মহিলাদের দশ হইতে পনর পর্যন্ত বিবাহ হইয়

থাকে। মিকিররা মামাত ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু মাসতুত এবং খুড়তুত ভগিনীকে বিবাহ করিতে কালে ভদ্রে দেখা যায়। যদি কোন মিকির ছেলে তাহার মামাত বোনকে বিবাহ না করে, তবে তাহার মামা নিজের ইচ্ছামত শাস্তি দিবে। বিবাহের পূর্বে ছেলে পক্ষ হইতে এক দল লোক মেয়ের বাড়ীতে যায়। মেয়ের পিতা জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা কেন আসিয়াছেন?" তাহার উত্তরে ছেলের বাবা বলে, "আমার স্ত্রী এখন বৃদ্ধা হইয়াছে, কাজ করিতে অক্ষম, তাই আমার ছেলের জন্য বৌ লইতে আসিয়াছি।" মেয়ের পিতা তাহার উত্তর দেয়, "আমার মেয়ে কাজ করিতে অক্ষম, সে কোন কাজ জানে না, কাপড় বুনিতেও জানে না।" তাহার উত্তরে ছেলের বাবা বলে, "আমরা আপনার মেয়েকে সব কাজ শিখাইয়া লইব।" এই কথোপকথন মিকিরদিগের সামাজিক প্রথা। তাহার পর মেয়ের পিতা তাহার স্ত্রীকে দিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করায় যে সে, তাহার ভাবী স্বামীকে পছন্দ করে কি-না এবং বিবাহে রাজী কি-না, তাহা জানিয়া দুই পক্ষে আমোদ করিয়া মদ্য পান করা হয়। ইহাদিগের মধ্যেও কনে কিনিবার রীতি আছে। কনের দাম দিতে না পারিলে পাত্রকে কনের পিতার বাড়ীতে থাকিয়া যত দিন পর্যন্ত না তাহাদিগের কোন সন্তান জন্মায় তাহার অধীনে চাকুরী করিতে হয়। একাধিক পত্নী এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ অতি অল্পই দেখা যায়।

মিশমিই:

মিশমিদিগের বাস ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে। ইহারা পার্বত্য জাতি। গুরুস্থানীয়েরা ইহাদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। মিশমিদিগের মধ্যে কনে কিনিবার রীতি আছে। ধনীরা বিশটি ষাঁড় দিয়া কনে কিনে এবং গরীবরা একটি শূকর দিয়া কনে কিনে। কনের মূল্য পরিবার ও অর্থ বুঝিয়া হয়। কনে কিনিবার ক্ষমতা না থাকিলে যত দিন পর্যন্ত না দাম শোধ হয়, কনের পিতার বাড়ীতে বরকে গতর খাটাইতে হয়। যত দিন পর্যন্ত না তাহাদিগের কোন সন্তান

জন্মাইবে তত দিন সেই বাড়ীতে থাকিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে কোন পুরুষ ব্যভিচার করিলে তাহার শাস্তি হয় মৃত্যু।

এ্যাবর অথবা পাদাম :

ইহারা আসামের পার্বত্য জাতি। এ্যাবররা কখন সমগোষ্ঠীভুক্ত মেয়েকে বিবাহ করে না। বিবাহের পূর্বে এ্যাবররা দুই জনে দুই জনের সহিত পরিচিত থাকে এবং বিবাহে সম্মত থাকে। ইহাদিগের মধ্যেও কনে কিনিবার রীতি আছে, তবে সেটা জিনিস কেনা-বেচার মত নহে। একাধিক পত্নী গ্রহণ অতি অল্পই দেখা যায়। শিশি এ্যাবরদিগের মধ্যে একাধিক পতি গ্রহণ সামান্য দেখা যায়।

বিভিন্ন দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আইন ও আন্দোলন

সব দেশেই এক ভাবনা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। সব দেশেই জনসংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলেছে। তবে সব দেশে এক হারে বাড়ছে না। কোনো দেশে একটু কম, কোনো দেশে সে অনুপাতে হয়ত একটু বেশী। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, বৃদ্ধির হার সাধারণতঃ সব দেশেই ওপরের দিকে। তাই সব দেশেই দেখা দিয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন। কোনো দেশে এই আন্দোলন সরকারীভাবে সমর্থিত, কোনো দেশে বা সে আন্দোলন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চালিত। মোটামুটি জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চলছে প্রায় সব দেশেই অল্প-বিস্তর। একমাত্র কয়েকটি কম্যুনিষ্ট দেশ ছাড়া।

সাধারণতঃ আমরা ভারতবর্ষ বা চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেই আঁৎকে উঠি। ভারতবর্ষ ও চীন আয়তনে ছোট দেশ নয়। তাই তার আয়তন অনুযায়ী লোকসংখ্যা অনেক বেশী। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ, ইউরোপে অনেক ছোট দেশের লোক-সংখ্যা, যার আয়তনও অনেক ছোট কিন্তু তাদের লোকসংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে তিন থেকে ছ' গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মাত্র দুই গুণ। তা ছাড়া ইউরোপের লোকসংখ্যা যেই বৃদ্ধি পায়, অমনি বছরে বছরে লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয় দেশ ছেড়ে যায় আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় বা আফ্রিকায়। ইউরোপের জনসংখ্যা বর্তমানে যা আছে তার সাথে আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আফ্রিকার শ্বেতকায় জনসংখ্যা যোগ দিলে দেখা যাবে যে, ইউরোপের জনসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে বাড়েনি ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা

যেমন বেড়েছে, ঠিক সেই অনুপাতে ইউরোপীয়দের মতন ভারতবাসীরা দেশ ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধেনি। তারা ভারতবর্ষেই রয়ে গেছে। যে ক'জন ভারতীয় ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্যত্র গেছেন তাঁদের সংখ্যা মাত্র তিন লক্ষ। এক ইউরোপ হতেই প্রতি বছরে পাঁচ থেকে সাত লক্ষ লোক বিভিন্ন মহাদেশে চালান যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

উপরন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান সমস্যা হল খাদ্য-বাসস্থান। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদি। তার প্রসার হলে ভারতবর্ষে খাদ্যসমস্যাও মিটবে। শুধু যদি আমরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি আমাদের খাদ্যের জন্যে, তাহলে আমরা বিফল-মনোরথ হবই। সে ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ করেও খাদ্যসমস্যা মেটাতে পারব না। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণই লোকসমস্যার প্রধান হাতিয়ার নয়। প্রধান হাতিয়ার খাদ্যোৎপাদন। অধিক খাদ্যোৎপাদন নির্ভর করে বিজ্ঞানের ওপর। দৈবগুণ বা আবহাওয়ার ওপর নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ পাদ্রি ম্যালথুস বলেছিলেন যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় কয়েক গুণ বেশী খাদ্যোৎপাদনের চেয়ে। সুতরাং লোকসংখ্যা কমানই উচিত। মনে রাখতে হবে যে, যে যুগে ম্যালথুস ও কথা বলেছিলেন সে যুগে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হয়নি। বিজ্ঞানের প্রভাব তখন ছিল অতি ক্ষীণ। ম্যালথুসের সে মত এখন সব দেশে খাটছে না। যেমন রাশিয়ায় ও আমেরিকায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে তার চেয়ে ডবল হারে বাড়ছে প্রতি বছরে খাদ্য। আমেরিকানরা তো প্রতি বছরে উদ্‌বৃত্ত খাদ্য হাজার হাজার টন পুড়িয়ে ফেলছে। এই দুই দেশের খাদ্যোৎপাদন অতি বৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে চাষাবাদে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়োগের ফলে। আমি এখানে শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে লোকসমস্যা থেকে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে, পরিবার ছোট হলে

আর্থিক সমস্যার কিছু সমাধান হবে। তবে ওটাই একমাত্র অবলম্বন নয়। কারণ আর্থিক উন্নতির মানদণ্ড এক এক দেশে এক এক রকমের। সবাই চায় উন্নত মানদণ্ড। সুতরাং আর্থিক উন্নতি না হলে সমস্যা, সমস্যাই রয়ে যাবে।

যাই হোক, জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে কোন দেশে কি রকমের প্রচেষ্টা চলছে তার ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল।

ইউরোপ

জার্মাণী : ১৯৪৫ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সমগ্র জার্মাণীতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের ঝড় ওঠে। ১৯৪১ সালে হিটলারের নাৎসী সরকার আইন বলে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বন্ধ করে। কিন্তু ১৯৪৬ সালেই পূর্ব-জার্মাণ সরকার নতুন আইন প্রয়োগে পুরোনো আইন বাতিল করে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আরোপ করে। পশ্চিম-জার্মাণীতে তেমন কোন কেন্দ্রীয় সরকারী আইন প্রবর্তিত না হলেও ১৯৫০ সালে নতুন আইনের বলে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্রব্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করে। পশ্চিম-জার্মাণীতে এক একটি প্রাদেশিক সরকারের এক একটি আইন প্রযোজিত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে। তবে বেশির ভাগ প্রাদেশিক সরকারই জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে আইন তো করেছেন, উপরন্তু শহরে শহরে ক্লিনিক খুলেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ কাজে সহায়তা করতে। সরকারী ক্লিনিকের চেয়ে পৌর প্রতিষ্ঠানের ক্লিনিকের সংখ্যাই বেশী।

অষ্ট্রিয়া : অষ্ট্রিয়া যখন জার্মাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিল তখন সেখানেও চলে হিটলারী নীতি। মাত্র ১৯৫২ সালে এক নূতন আইন বলে পুরোনো জার্মাণ আইন পরিবর্তিত হয়। এই আইনের ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ খুব বেশী প্রসার লাভ করেনি। জার্মাণীর মতন যেখানে সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদি অষ্ট্রিয়ায় বিক্রয় করা হয় না। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত ও সব জিনিস বিক্রয় নিষেধ। কিন্তু সোস্যালিষ্ট পার্টি জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন তো

করেছেনই, উপরন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ক্লিনিকও খুলেছেন।

বৃটেন: জনসংখ্যা সম্বন্ধে প্রথম আন্দোলন তোলেন ইংলণ্ডের ম্যালথাস। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে, খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুতহারে এবং সেই বৃটেনে যত লোকসংখ্যা বেড়েছে গত পঞ্চাশ বছরে তত বাড়েনি ভারতবর্ষে বা ফ্রান্সে। কিন্তু সেই বৃটেনে আজও পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন আইন চালু হয়নি।

১৯৪৯ সালের জনসংখ্যা সম্বন্ধে রয়াল কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত পিতৃত্ব সম্বন্ধে যদি সবিশেষ সজাগ হয় তাহলে বৃটেনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

বৃটেনের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েসান ১৯৫২ সালে সমস্ত বৃটেনময় ৯৪টি তাদের শাখা-অফিস ও ১১২টি ক্লিনিক খুলে জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তার পরে প্রতি বছরে সে ক্লিনিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

বেলজিয়াম: ১৯২৩ সালের সরকারী আইন বলে বেলজিয়ামে সব রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনই বন্ধ করা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সব আন্দোলনই বে-আইনী সেখানে।

ডেনমার্ক: ডেনমার্কে জন্মনিয়ন্ত্রণ সপক্ষে কোনো আইন না থাকলেও ওখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাত বে-আইনী নয়। মহিলা ডাক্তার সমিতির পক্ষ থেকে ডেনমার্কে অনেকগুলি ক্লিনিক চালান হয়ে থাকে। এই সমিতি জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে থাকে।

ফিনল্যাণ্ড: ফিনল্যাণ্ডে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোনো সরকারী আইন নেই কিন্তু গর্ভপাত বে-আইনী নয়। জনসংখ্যা সমিতি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আন্দোলন তো চালায়ই উপরন্তু তাদের আছে বিভিন্ন ক্লিনিক। এই সব ক্লিনিক থেকে দেওয়া হয় সব রকমের সাহায্য।

ফ্রান্স : ফ্রান্সের সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, জনসংখ্যা হ্রাস। তাই ফরাসী সরকারের ১৯২০ সালের আইন বলে সব রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনই বন্ধ করা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পক্ষে প্রকৃত কোনো সমিতিই নেই ফ্রান্সে। তবে দু'-একজন খাপছাড়া আন্দোলন করে থাকেন মাঝে মাঝে।

হল্যাণ্ড : হল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তা সত্যি ভয়াবহ! বর্তমানে হল্যাণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে লোকঘনত্ব হল ৩১৬ জন, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তার অর্দ্ধেক। হল্যাণ্ড প্রতি বছরে লাখ খানেক করে পাঠাচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশে। কিন্তু সে দেশে নেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী আইন। তবে ইউরোপে একমাত্র হল্যাণ্ডে ১৯৩৯ সালে খোলা হয় প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক। তারপরে অবশ্য আরও অনেক ক্লিনিকের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু সবই বেসরকারী। এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়নি।

ইতালি : ইতালিতে এখনও সেই পুরোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ-বিরোধী আইন চলছে। মুসোলিনির আমলে ফাসিস্ত সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ রোধ করতে আইন করে। সেই আইনের বলে যে কোনো রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনই নিষিদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপে ইতালি দরিদ্র দেশ তো বটেই, তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশ উচ্চ। কেবল মাত্র ১৯৫০ সালে ফ্লোরেন্স শহরে সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আন্দোলন উচ্চারিত হয়। তারপর ১৯৫২ সালে মিলানে প্রতিষ্ঠিত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানটির শাখা ছড়াতে থাকে ইতালির অন্যান্য শহরে।

নরওয়ে : ১৯৫২ সালে নরওয়েতে কম করে পনরটি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং তার বেশির ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রই সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত। গর্ভপাত যদিও আইনসঙ্গত নয়, তাহলেও বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে ওই আইন কড়াকড়ি নয়।

সুইডেন: সুইডেনে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সব রকমের পন্থাই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। অনেক কাল আগে ১৯৩৩ সালে ওখানে স্থাপিত হয় যৌনশিক্ষা-সমিতি। ওই সমিতির তত্ত্বাবধানে সুইডেনে রয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। তার সভ্যসংখ্যা হল এক লক্ষ। সুইডেনে গর্ভপাত আইনসঙ্গত। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চলছে সুইডেনে জোরসে।

সুইজারল্যাণ্ড: জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সুইজারল্যাণ্ডে কোনো আইন নেই যদিও কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদি আইন-বিরুদ্ধ নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পক্ষে কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নেই ওখানে কিন্তু কয়েকটি ছোটখাট স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অনেক কাল ধরে।

এশিয়া

ঈজিপ্ত: সরকারী ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন স্বীকৃত হয়নি, কিন্তু ১৯৫২ সালে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী তৌফিক পাশা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আন্দোলন তোলেন। ১৯৫৩ সালে ঈজিপ্ত সরকার লোকসমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানর কাজে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে ও জাতিসংঘের উপদেশ প্রার্থনা করে।

ইস্রায়েল: জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোনো আইন তো নেই বরং গর্ভপাত বে-আইনী। এবং আইনভঙ্গকারীর সাজা হয় চৌদ্দ বছরের হাজতবাস। কিন্তু ১৯৫০ সালে থেলআভিব শহরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান জন্মনিয়ন্ত্রণকারীদের শুধু পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইহুদি ধর্মমতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বে-আইনী।

তুর্কি: তুর্কিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন নিষিদ্ধ।

সিংহল: সিংহলে যদিও এখন পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী আইন প্রবর্তিত হয়নি, তাহলেও ১৯৫৩ সালে

সিংহল সরকার আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসমিতির সাহায্যে কলম্বো শহরে দুইটি জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক স্থাপন করে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও কয়েকটি ক্লিনিক। সেই থেকে ওখানে চলছে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন।

চীন: কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোনো আইন না থাকলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে চীন সরকার। চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেয়ে শিশুমৃত্যু হার সম্পর্কে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্যে অনেক আইন তৈরী হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে পুরুষেরা, কিন্তু মেয়েরা তার পক্ষে। তাই চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করছে।

ফরমোজা: ১৯৫৪ সালে ফরমোজায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয়েছে ও নতুন আইনের আওতায় আসে। ফরমোজার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্লিনিক।

হংকং: হংকংএ কোনো সরকারী আইন নেই জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে ছটি জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক।

ভারত: জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয় সরকারী ভাবে ১৯৫১ সালে। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা ব্যয় করেন জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয় হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। ভারতের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন ও ক্লিনিক সমূহ সবই সরকারী প্রচেষ্টার ফলে। যদিও কোনো বাঁধাধরা আইন কানুন নেই তাহলেও জন্মনিয়ন্ত্রণে কোনো আইনের তরফ থেকে বাধা নেই। এমন কি গর্ভপাতের ব্যাপারেও।

ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী প্রচেষ্টা এখনও শুরু হয়নি। তবে একটি সামাজিক দল

'পার্তিয়া ভনিতা রক্ষত' গঠিত হয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চালাতে।

জাপান: ১৯৪৮ সালের নতুন আইনের বলে জাপানে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সব রকমের আন্দোলনই আইনত সমর্থিত হয়েছে। এমন কি গর্ভপাত পর্যন্ত আইনত সিদ্ধ।

একমাত্র এশিয়ায় জাপানে যত জন্মনিয়ন্ত্রণ সমিতি ও ক্লিনিক আছে তেমনটি নেই অন্য কোনো দেশে। ১৯৫১ সালের পর থেকে জাপানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সমিতি ও ক্লিনিক-সমূহ। এত ব্যাপক আন্দোলন বোধ হয় আর কোনো দেশে নেই।

পাকিস্তান: জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী প্রচেষ্টা তেমন নেই। তবে ১৯৫৩ সালের পর থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে পাঁচ ছ'টি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে।

মালয়-সিঙ্গাপুর: সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সুরু হয় ১৯৪৯ সালে। সরকার প্রতি বছরে প্রায় লাখ খানেক টাকা খরচ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে ও ক্লিনিকে।

থাইল্যাণ্ড: থাইল্যাণ্ডে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সুরু হয়েছে ১৯৫২ সালে এবং সে প্রচার সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র ব্যাংককের একটি হাসপাতালে। উপরন্তু ১৯৫৩ সালে থাই-সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বন্ধ করার জন্যে আইন প্রণয়ন করতে প্রস্তুত হলে সে প্রস্তাব আপাতত স্থগিত থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়া: অষ্ট্রেলিয়ায় কোনো সরকারী আইন-কানুন নেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। বরং কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে। ১৯৫৩ সাল থেকে ওখানে চলছে অতি ক্ষীণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রচার।

নিউজিল্যাণ্ড: অষ্ট্রেলিয়ার মতন এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী প্রচারকার্য চলে না। বরং ১৯৩৬ সাল থেকে সম্পর্কে আন্দোলন

তো চলছেই, উপরন্তু ব্যাপক ভাবে স্থাপিত হয়েছে সমিতি ও ক্লিনিকসমূহ।

আমেরিকা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র : সরকারী ভাবে কোনো আইন প্রযোজিত না হলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে ১৯৪৮ সালের পর থেকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুইটি প্রদেশ ছাড়া সব প্রদেশেই জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আইনসঙ্গত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সবশুদ্ধ ক্লিনিকের সংখ্যা হল ৫১৯টি। নিউইয়র্কের 'দি প্ল্যান্‌ড পেরেণ্ট হুড ফেডারেশন অব আমেরিকা' হল জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের মুখ্য সংগঠন সমিতি। এরই বিভিন্ন শাখা আন্দোলন ও ক্লিনিক পরিচালনা করে সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে।

কানাডা ও দক্ষিণ-আমেরিকা : কানাডা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন নেই বললেই চলে। কারণ ওই সব দেশে লোকাভাব।

মধ্য আমেরিকা : মধ্য আমেরিকায় কোর্তোরিকো, বারবাডাস, বারমুডা, জামাইকা ও বাহামায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চলছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ক্লিনিকের কাজ চলে ওখানে নিয়মিত ভাবে।

আফ্রিকা

দক্ষিণ-আফ্রিকা : আফ্রিকার একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকায়ই জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সরকারীভাবে সমর্থিত। অনেকগুলো সমিতি ক্লিনিক পরিচালিত হয় পৌর প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক।

শতায়ু

এখনও বৃদ্ধেরা আশীর্বাদ করার সময় বলে থাকেন, 'বেঁচে থাক বাবা, শতায়ু হও।' একশ বছর বাঁচা বা তারও বেশীদিন বাঁচাটা প্রায় সকলেরই কাম্য। আসলে সবাই অতদূর পৌঁছতে পারেন না বলেই শতায়ু কামনা করে থাকেন। শুধু শতবর্ষ বাঁচলেই তো হল না। বুড়ো-জবু-থবু হয়ে বাঁচতে চান না কেউ।

এদিকে মেঘে-মেঘে বেলা অনেক হচ্ছে সে খেয়াল অনেকের থাকে না। যাদের অকালে চুল পাকে তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সত্যি সত্যি বার্ধক্যে পা দিয়ে যখন দেখেন, বার্ধক্যের নোটিশ-স্বরূপ রূপোলী তারার মতন এদিকে-সেদিকে মাথার ঝোপে উঁকি মারতে শুরু করেছে, তখন যৌবনবিলাসিরা বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের ডেকে বা গোপনে স্ত্রীর সাহায্যে পাকা চুলকটা সমূলে উৎপাটন করে বৃদ্ধ যে তিনি নন অথবা হতে চান না তারই পরিচয় দিয়ে থাকেন। 'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে' যেমন, তেমনি বুড়ো হতে কেউ চান না। অটুট যৌবন রাখতে অনেকেই তো ডাক্তার-হাকিম-বদ্দির স্মরণাপন্ন হন। সে খবর কে না জানে।

তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে একপাল অকালপক্কের কাছ থেকে শোনা যাবে, 'আর কি! বয়স তো কম হল না। বুড়ো হয়েছি। এবার গঙ্গাযাত্রা হলেই বাঁচি।' এই সব অকালপক্কদের বয়স তিরিশের কোঠায়। আবার তারই উল্টো একদল সত্যিকারের বুড়ো, বাহাত্তুরে বলাই ভাল, তাঁরা 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' মুখে না আউড়ে সত্যি সত্যি তরুণী ভার্যাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন (এখন যা দিন কাল, পাড়ার ছোকরারা নাকি এই সব বৃদ্ধ বরদের 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে পাড়া হতে বিদায় দিয়ে থাকেন)।

আসলে আমাদের দেশে গড়পড়তা আয়ু কম বলেই বোধ

হয় শতায়ু কামনা করা হয়ে থাকে। যে-কোনো ঠিকুজি কোষ্ঠী খুলে দেখুন। হিন্দু জ্যোতিষিরা আয়ুষ্কাল একশ বছর ধরে নিয়ে চার ভাগে ভাগ করেন।

আয়ুষ্কাল বাড়ানোর চিন্তা আজকের নয়। যে দিন বেদ লেখা শুরু হল, সেই পাঁচ হাজার বছর আগে, তখনই শুরু হল 'আয়ুর্বেদ' লেখা। চতুর্বেদের মধ্যে 'আয়ুর্বেদ' অন্যতম। যার ফলে হিন্দু-মতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সূত্রপাত। অর্থাৎ অসুখ-বিসুখের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর চিন্তা তখনকার বৈদিক চিকিৎসকদের মাথায় হরদম খেলেছিল। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে নাগার্জুন নামে এক ভারতীয় রাসায়নিকের নাম শোনা যায়। রাসায়নিক নাগার্জুন কিন্তু সত্যিকারের রাসায়নিক ছিলেন। তিনিই প্রথমে শল্য-চিকিৎসা, ডিসটিল্ড ওয়াটার, পারদের নানান রকমের ব্যবহার ইত্যাদির প্রয়োগ শুরু করেন। সেই রাসায়নিক নাগার্জুন নাকি কয়েকশত বছর বেঁচেছিলেন এবং তাঁরই আবিষ্কৃত 'জীবন রসায়ন' পান করে শতবাহন সম্রাটও নাকি কয়েকশত বছর বেঁচেছিলেন। অবশ্য এর অনেক গল্প পাওয়া যাবে 'কথাসরিৎসাগরে'। অনেকখানি গল্প হলেও, এর থেকে জানা যায় যে, নাগার্জুন আয়ুষ্কাল বাড়নোর হয়ত কোনো চিকিৎসার উদ্ভাবন করেছিলেন।

বার্ধক্য-নিরোধক ওষুধ আজকের কল্পনা নয়, সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। বার্ধক্য দূরের কথা আজ-কাল তো পঞ্চাশ-ষাটের বেশী অনেকেই পেরোতে পারেন না। বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনেকেই তো পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যেই আজকাল সাবাড় হয়ে যাচ্ছেন। নিয়মিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বা 'যুগান্তর' যদি পড়েন তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, যে-সমস্ত বাঙালী কর্মবীর বা রাজনৈতিক নেতা মারা যাচ্ছেন তার অনেকাংশই পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। বাংলাদেশ কেন ভারতে গড়পড়তা আয়ু তো মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ। ইউনাইটেড নেশনস্

ডেমোগ্রাফিক ইয়ার বুকের (১৯৫৬) তথ্য থেকে জানা যায় কোন্ দেশে কত গড়পড়তা আয়ুষ্কাল।

দেশ	বছর	গড়পড়তা আয়ু
হল্যাণ্ড	(১৯৫০-৫২)	৭০.০
বৃটেন	(১৯৫৪)	৬৭.৬
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৫৪)	৬৭.৪
ফ্রান্স	(১৯৫০-৫১)	৬৩.৬
ইতালি	(১৯৩৫-৩৭)	৫৭.৫
পর্তুগাল	(১৯৪৯-৫২)	৫৫.৫
ব্রাজিল	(১৯৪৯-৫১)	৪৯.৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	(১৯৪৫-৪৭)	৪১.৭
মেক্সিকো	(১৯৪০)	৩৭.৯
কংগো	(১৯৫০-৫২)	৩৭.৬
ভারত	(১৯৪১-৫০)	৩২.৪

এসব সংখ্যাতত্ত্বের বড় কথা ছেড়ে দিলেও ভারতে এখনও দুটো চারটে উদাহরণ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন অনেকেই একশ দশ কি বিশে মারা গেছেন। এই তো সেদিন সংবাদে পড়লাম পূর্ব আফ্রিকার ডারবান শহরে এক ভারতীয় মহিলা ১১০ বছরে প্রাণত্যাগ করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার স্মেদরেভস্কা পালাম্‌কা গ্রামে এই তো সেদিন ইয়েলেনা জিভানোভিচ নামে এক বৃদ্ধা তাঁর ১০৮ বছরের জন্মদিন পালন করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। জিভানোভিচ এখনও সম্পূর্ণ সক্ষমভাবেই খাটছেন। সারা জীবনে মাত্র একবার, তাও ১০২ বছর বয়সে নাকি ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলেন। পশ্চিম আফ্রিকার এক বৃদ্ধ যাঁর বয়স ১১২ বছর, তাঁকে তাঁর দীর্ঘায়ুর গোপন তথ্যটা কি জানতে চাইলে বলেছেন যে তিনি মনের স্ফূর্তিতে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর এক শতাব্দীর বয়সে ডজন খানেক স্ত্রীলোক ছিল। তারা সবাই পরলোকে। তিনি তাঁর নাতিদের নিয়ে মহাসুখে বসবাস করছেন।

মাস কয়েক আগে সোভিয়েট ইউনিয়নে একুশ হাজার বৃদ্ধ 'শতায়ু উৎসব' পালন করেছেন। এই একুশ হাজার শতায়ুদের মধ্যে ১৩,৫৫০ জন বৃদ্ধের বয়স ১০০ থেকে ১০৪, ৪১৮৩ জন বৃদ্ধের বয়স ১০৫ থেকে ১০৯ বছর, '৩৮৪ জন বৃদ্ধের বয়স ১১০ থেকে ১১৪ বছর। অবশেষে ১১২৪ জন বৃদ্ধ ধর্মযাজকদের বয়স ১১৫ থেকে ১২০ বছর। তবে শতায়ুদের মধ্যে বৃদ্ধাদের সংখ্যাই বেশী। ৫,৪৩২ জন বৃদ্ধ আর ১৬২৭৬ জন বৃদ্ধা। সেভিয়েট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, বৃদ্ধদের সংখ্যা শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেই বেশী। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতি এক লাখে দশজন করে শতায়ু; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১.৫; ফ্রান্সে ০.৭; বৃটেনে ০.৬ আর জাপানে ০.১।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শতায়ুরা সুস্থ, সবলভাবে বেঁচে আছেন সাইবেরিয়ার মতন ভীষণ ঠাণ্ডা অঞ্চলে। ঠাণ্ডায় নাকি আয়ু বাড়ায়। শতায়ু বৃদ্ধরা বলেছেন যে, তাঁদের অটুট স্বাস্থ্যের আরেক প্রধান কারণ হল ককেশাস পর্বতমালাঞ্চলের দই। রুশরা কিন্তু দৈনিক দই খায়। অবশ্য দই-এর প্রচলন প্রথম শুরু হয় বুলগারিয়ায়। তাই লাতিন ভাষায় দইকে বলে ব্যাকাটেরিয়াস্ বুলাগারাস্।

শতায়ুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত-সমর্থ হলেন মধ্যপ্রাচ্যের সায়েদ আলি। এঁর বয়স এখন ১৮৯ বছর। ইজিপ্তের কাইরো শহরে এখনও বেঁচে আছেন ২০০ বছরের বৃদ্ধ আমার সহাৎ। ইনি ইজিপ্তে নেপোলিয়নের বিজয় অভিযান দেখেছেন। ইনি প্রথমে একবার বিয়ে করেন ৪০ বছর বয়সে আর দ্বিতীয়বার ১২০ বছর বয়সে। কলম্বিয়ার জাভিয়ের পেরেরার বয়স বর্তমানে ১৬৭ বছর। তিনি গত বছরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন ওয়াশিংটনের ছবি নিয়ে। ওয়াশিংটন যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল ছ' বছর। ন' বছর বয়সে তিনি নেপোলিয়নের রুশ অভিযান যেমন দেখেছেন, তেমনি ১১৪ বছর বয়সে

দেখেছেন রুশ বিপ্লব। এখনও তিনি বিনা চশমায় সুঁচে সুতো পরাতে পারেন।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, বার্ধক্য বিতাড়ন ও আয়ু বাড়ান বা ধরা যাক মৃত্যুকেই বাতিল করতে হলে সর্বপ্রথম ভাল করে জানতে হবে জীবন-রহস্য। সে হল প্রাণীর জন্ম উৎস। প্রাণ বা জন্ম-উৎসটা বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি জানা হয়ে গেলে তখন আয়ু বাড়ান শক্ত হবে না। ইতিমধ্যে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পেত্রুচ্চী তাঁর গবেষণাগারের টেস্ট টিউবে রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলে (কোনো প্রাণীর শুক্রকীট দিয়ে নয়) একটি কৃত্রিম জীব সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সেই জীব বা ভ্রূণ হতে মাস দুই পর্যন্ত তার প্রতিদিনের গতিবিধি তিনি সিনেমা ছবির মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। এখনও চলছে তাঁর গবেষণা। কৃত্রিম জীবসৃষ্টির মূলে রয়েছে এ যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের দান, সে হল এ-ডি-এন। এ-ডি-এন আবিষ্কারের পর থেকে প্রাণীবিজ্ঞানের উন্নতি দ্রুত বেগে হচ্ছে। তারই বলে কৃত্রিম জীব সৃষ্টি সফল হতে চলেছে। এই এ-ডি-এন এবং আরও নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে, এমন কি হরমোন ইত্যাদির প্রয়োগের ফলে শতায়ু কেন, তারও বেশী দিন আয়ু বাড়ান সম্ভব হবে বলে প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলছেন। কিছুদিন আগে এক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এ যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার কি? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, স্পুটনিক, রকেট বা এ্যাটম বোমা নয়, সে হল এ-ডি-এন। এই এ-ডি-এন-এর ফলে জীবনরহস্য প্রকাশ পাবে।

বিগত একশ বছর ধরে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বা প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে ফল ও ফুলের, গাছ-গাছড়ার অনেক পরিবর্তন যেমন সাধিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে ইঁদুর, খরগোস, বাঁদর নিয়ে প্রচুর গবেষণা। যার ফলে কোনো কোনো বিজ্ঞানী তো এদের জাতের পরিবর্তন থেকে লিঙ্গের পরিবর্তন আনতে পেরেছেন।

শুক্রকীটের মিলনে জীবের জন্ম। তারপর তার পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু শুক্রকীট সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছেন বিভিন্ন দেশের প্রাণী-বিজ্ঞানীর দল। তাঁরা জীবনের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হলে তখন বার্ধক্য বা শতায়ু আর একটা প্রশ্ন বলেই থাকবে না। তখন ডাক্তারী চিকিৎসার মতন আয়ুর চিকিৎসা বা বাড়ান কমান চলবে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় সমাজের গতি

মানুষ নিয়ে সমাজ। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, জন্মহার মৃত্যুহার এর মাপ-জোক থেকে সমাজের গতি মাপা যায়। সমাজবিজ্ঞানে জাত-পাঁতের হিসেব ও প্রভাব কম নয়। ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্ট বা আদম স্নুমারীর বিবরণে জানা যায় কিভাবে প্রধানতঃ গত একশ বছর ধরে ভারতে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। লোক সংখ্যা বাড়া বা কমাটাই বড় কথা নয়। যারা জন্মালো তার কজন বেঁচে রইল, বা যারা বেঁচে রইল তাদের দৈহিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ। এইসব আলোচনা 'ডেমোগ্রাফি'র আলোচ্য বিষয়। 'ডেমোগ্রাফি' সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা।

ভারতে লোকগণনা সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তাঁর আগের কোনো হিসাব নেই। আলেকজাণ্ডার-এর ভারত আক্রমণকালে তাদের হিসেবে জানা যায় যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাষ্ট্রগুলোতে লোকসংখ্যা কম ছিল না। একটি রাজ্যে ছিল সাঁইত্রিশটি নগর, আর প্রতিটি নগরে কম করে পাঁচ হাজার লোকের বাস ছিল। তারপর চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তার সামরিক বাহিনীতেই ছিল সাত লক্ষ সৈন্য। এর থেকেই প্রমাণিত হয় ঐসময়ে উত্তর ভারতে লোকসংখ্যা বেশ যথেষ্ট ছিল। আর যিশুখৃষ্ট জন্মাবার তিন'শ বছর আগে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল দশ থেকে চৌদ্দ কোটী। (জি, নাথ—এ ষ্টাডি ইন ইকনমিক কনডিশনস্ অব এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, ১৯২৯, পৃঃ ১২০) তারপরে ভারতে চলেছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজাদের উত্থান-পতন, বিদেশীদের আক্রমণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকসংখ্যা

ছিল দশ কোটী, এই অনুমান করা যায়। (ডব্লু, এইচ, মোরল্যাণ্ড— ইণ্ডিয়া এট্ দি ডেথ্ অব আকবর। ১৯২৯, পৃঃ ৭১) তবে এও অনুমিত হয় যে, ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটী লোক মারা গেছে শুধু মহামারীতে।

সাল	কতবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে	কতলোক মরেছে
১৭৭৫—১৮০০	৩	—
১৮০০—১৮২৫	৫	১,০০০,০০০
১৮২৬—১৮৫০	২	৪০০,০০০
১৮৫১—১৮৭৫	৬	৫,০০০,০০০
১৮৭৬—১৯০০	১৮	২৬,০০০,০০০

(এস, কে, চ্যাটার্জী—দি স্টারভিং মিলিয়নস্, ১৯৪৪,পৃঃ ৮৫— ৮৬)

দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে শুধু মৃত্যু হলে কোনো কথা ছিল না। যারা বেঁচে রইল তাদের অবস্থা অর্দ্ধমৃতের ন্যায়। সেই অর্দ্ধমৃতের দল তখন কর্মক্ষম নয়। ফলে চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য বা গ্রাম্য শিল্পের কাজ সবই তখন থাকে প্রায় বন্ধ। জাতীয় উৎপাদন কমতে বাধ্য। জাতীয় উৎপাদন কমা মানে প্রত্যেকের আয় কমা। ফলে আসে দারিদ্র্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দরুন কত বর্গমাইল অনুপাতে লোকজন বিপদগ্রস্ত হয়েছিল তার একটা হিসেব দেওয়া গেল। (পি, এ, ওয়াদিয়া এবং কে, টি, মার্চেন্ট—আওয়ার ইকনমিক প্রবলেম, ১৯৫৪, পৃঃ ১০৫)

বছর	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	কাজে রত লোকসংখ্যা
১৮৮৮—১৮৮৯	৩৫০০	১,০০০,০০০	৬৪,০০০
১৮৯১—১৮৯২	৫০,০০০	৭,০০০,০০০	২৪০,০০০
১৮৯৬—১৮৯৭	২২৫,০০০	৬২,০০০,০০০	৩,৩০০,০০০
১৮৯৯—১৯০০	১৮৯,০০০	২৮,০০০.০০০	৪,৬০০,০০০

ভারতীয় লোকগণনার ইতিহাসে এই হল পটভূমিকা। এর ভেতর কিভাবে আমাদের লোকসংখ্যা বেড়েছে তার হিসেব দিচ্ছি।

বছর	সূত্র	মিলিয়ন বা দশলক্ষ হিসেবে লোকসংখ্যা	বৃদ্ধি%
১৬০০	(১)	১০০	
১৭৫০	(২)	১৩০	
১৮৪৮	(৩)	১৩৩	
১৮৫০	(৪)	১৫০	
১৮৬১	চন্দ্রশেখর (৫)	১৬৪	—
১৮৭২	প্রথম ও অসম্পূর্ণ সেন্সাস রিপোর্ট	২০৬২	—
১৮৮১	সেন্সাস রিপোর্ট	২৫৩·৯	১·৫
১৮৯১	ঐ	২৮৭·৩	৯·৬
১৯০১	ঐ	২৯৪·৩	১·৪
১৯১১	ঐ	৩১৫·২	৬·৪
১৯২১	ঐ	৩১৮·৯	১·২
১৯৩১	ঐ	৩৫২·৯	১০·৬
১৯৪১	ঐ	৩৮৮·৪	১৪·৪
১৯৫১	ঐ (৬)	৩৫৬·৯	১৬·৯
১৯৬১	ঐ (৭)	৪৩৬·৪ (অসম্পূর্ণ)	২১·৪

১৯৩১—১৯৪১ সালের মধ্যে বার্মা ভারত ছেড়ে পৃথক রাষ্ট্র হয়েছে, ১৯৪১—১৯৫১ সালের মধ্যে পাকিস্থান রাষ্ট্র তৈরী হয়েছে। তার ফলে কম করে এগার-বার কোটী লোক কমেছে ১৯১১ সালের পর থেকেই ভারতে লোকসংখ্যা উর্ধ্বমুখে। তার কারণ উনবিংশ

(১) মোরল্যাণ্ড—ইণ্ডিয়া এ্যাট দ ডেথ্ অব আকবর (১৯২৭) পৃঃ ৭১
(২) শিরা—পভার্টি এ্যাণ্ড কিণ্ড্রেড প্রবলেম অব ইণ্ডিয়া (১০৩১) পৃঃ২৬
(৩) ম্যাক্‌কুলক্—ডেসক্রিপটিভ্ এ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিসটিকাল এ্যাকাউন্টস্ অব বৃটিশ এম্পায়ার (১৮৪৭)
(৪) আর, কে, মুখার্জী—ফুড প্ল্যানিং ফর ৪০০ মিলিয়নস্ (১৯৩৮) পৃঃ ৩

শতাব্দীর মতন দুর্ভিক্ষ নিত্য লেগে নেই, মহামারী রোগ অনেক কমেছে।

অর্থাৎ মৃত্যুহার কমেছে বলে জীবিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৬১ সালের লোক গণনায় জানা যায় যে মোট তেতাল্লিশ কোটি আশিলক্ষ লোকের মধ্যে ২২৫·০ মিলিয়ন হল পুরুষ আর ২১১·৪ মিলিয়ন স্ত্রী। ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে ভারতে লোক বেড়েছে ৭৯ মিলিয়ন অথবা শতকরা ২১·৪৯ %। অনন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, জম্মু-কাশ্মির, মাদ্রাজ, মহিশূর, উড়িষ্যা ও উত্তর-প্রদেশে লোকবৃদ্ধির হার কম। সেদিক দিয়ে আসাম, গুজরাত, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও পশ্চিম বঙ্গের লোক বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। সবচেয়ে বেশী হারে বেড়েছে আসামের (শতকরা ৩৪·৩০%) আর পশ্চিম বঙ্গের (শতকরা ৩২·৯৪%)।

ভারতে প্রতিবর্গ মাইলে লোক-ঘনত্ব ১৯৫১ সালে ছিল ৩ ৬, ১৯৬১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৮৪। সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৮২% জন বাস করে গ্রামে। ১৯৫১ সালে ১০০০ পুরুষে ছিল ৯৪৬ জন স্ত্রী আর ১৯৬১ সালে সে সংখ্যা হয় ৯৪০। ১৯৬১ সালের লোক গণনা থেকে জানা যায় ভারতে শতকরা ২৩·৭% জন লিখতে পড়তে জানে, পুরুষের মধ্যে ৩৩.৯% জন আর স্ত্রী লোকদের মধ্যে ১২.৮%। ১৯৫১ সালের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা বেড়েছে ০.৭% প্রতি বছর।

লোকসংখ্যা ও লোকসমস্যা নিয়ে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান মতে আলোচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ পাদ্রী ম্যালথাস। তাঁর মতে

---

(৫) এস, চন্দ্রশেখর—ইণ্ডিয়ান পপুলেশন, (১৯৪৬) পৃঃ ৫৪

(৬) ঐ —"দি কমপোজিশন অব ইণ্ডিয়াস পপুলেশন এ্যাকর্ডিং টু দি ১৯৫১ সেন্সাস।" পপুলেশন রিভিউ, জানুয়ারী পৃঃ ৬৩—৭৮

(৭) সেন্সাস অব ইণ্ডিয়া, প্রেস কমুনিকে, এপ্রিল ১৯৬১

খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় লোক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সেটা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী। একালে কিন্তু বিজ্ঞান প্রয়োগে খাদ্য বৃদ্ধি হতে পারে দশ পনর গুণ বেশী। তার প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন। ওই দুই দেশে বাৎসরিক লোক বৃদ্ধির হার কিন্তু ভারতের চেয়ে বেশী। কিন্তু তাদের খাদ্য ও শিল্পোৎপাদন লোক বৃদ্ধি হারের চারগুণ করে বাড়ছে। ফলে সেখানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধিটা সমস্যা নয়। সমস্যা হল অত্যধিক উৎপাদন। কিন্তু ভারতের বেলায় ঠিক উল্টোটা ঘটছে।

বিখ্যাত ফরাসী লোকসংখ্যাবিদ্ মঁ আডোলফ্ লন্‌ড্রি বলেছেন যে, লোক বৃদ্ধি হওয়াটা সভ্যতার চিহ্ন। কারণ প্রধান গ্রীস ও রোমের সভ্যতার লোক সংখ্যা কম ছিল না। বরং লোক সংখ্যা কমলে সভ্যতার সংকট দেখা দেয়। (৮) তাছাড়া ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতের লোক বৃদ্ধি বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় খুব একটা সাংঘাতিক ছিলনা।

১৮৮০—১৯৩০ পর্যন্ত লোক বৃদ্ধির হার। (৯)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৮৬%
বৃটেন	৫৪%
জাপান	৭৪%
ইতালি	৪৬·৮%
সুইজ্যারল্যাণ্ড	৪৩·৫%
জার্মানী	৪২·২%
ভারত	৩৯·০%

এ গেল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। ১৯৬১ সালের হিসেবে বড় দেশগুলোর মধ্যে লোকবৃদ্ধির হার প্রতি বছরে বেড়েছে চীনে

---

(৮) এ, লন্‌ড্রি, ত্রেইতে ডেমোগ্রাফি, প্যারিস ১৯৪৬,পৃঃ ৪৮

(৯) বিনয় সরকার, দি সোসিওলজি অব পপুলেশন (১৯৩৬) পৃঃ ৫৬

১'২ থেকে ২'৩%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১'৭ থেকে ১'৮%, ভারতে ১'৫ থেকে ১'৭% ও সোভিয়েট ইউনিয়নে ১'৭ থেকে ১'৮%। (১০)

লোকসংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমন কিন্তু গড়পরতা আয়ু বাড়েনি। শিশু মৃত্যু আরও বেশী কমেনি। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের গড়পড়তা আয়ু:

দেশ	বছর	আয়ুকাল (১১)
হল্যাণ্ড	(১৯৫০-১৯৫২)	৭০'০
বৃটেন	(১৯৫৪)	৬৭'৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৫৪)	৬৭'৩
ফ্রান্স	(১৯৫০-১৯৫১)	৬৩'৬
ইতালি	(১৯৩৫-৩৭)	৫৭'৫
পর্তুগাল	(১৯৪৯-৫২)	৫৫'৫
ব্রাজিল	(১৯৪৯-৫১)	৪৯'৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	(১৯৪৫-৪৭)	৪১'৭
মেক্সিকো	(১৯৪০)	৩৭'৯
কংগো	(১৯৫০-৫২)	৩৭'৬
ভারত	(১৯৪১-১৯৫০)	৩২'৪

আয়ু বাড়াতে হলে আয় বাড়াতে হবে। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে। তার জন্যে চাই উন্নত ধরনের চাষ-বাস, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, চিকিৎসা ও সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি। আর্থিক উন্নতি কল্পেই দেশে সুরু হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতি। কৃষির উন্নতি কল্পে নানা বাঁধ নির্মাণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল যন্ত্রশিল্প, কারখানা ও বিদ্যুৎউৎপাদন বাড়ান। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ওই দুটোই দ্বিগুণ ভাবে বাড়ান হচ্ছে যাতে কৃষি ও যন্ত্র-শিল্প দুয়ের বৃদ্ধি হতে পারে। কৃষির উন্নতি করতে হলে চাই

(১০) ইউনাইটেড নেসনস্ ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক্, ১৯৬১।

(১১) ইউনাইটেড নেশনস্ ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক, ১৯৫৬

চাষের যন্ত্রপাতি, সার, জল—নালা ও বাঁধ। যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ও উৎপাদন না বাড়লে এগুলো সৃষ্টি করা যায় না। যেমন লোহার কারখানা না নির্মাণ করলে চাষ করায় লোহার যন্ত্রপাতি নির্মিত হতে পারে না। সুতরাং আগে চাই লোহার কারখানা। আবার লোহার কারখানা চালাতে হলে চাই বিদ্যুৎ উৎপাদন। এই সবই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারত সরকার ব্যয় করেছে ১২০, ০০০, ০০০, ০০০ টাকা। তার ফলে শিল্পোৎপাদন হয়েছে ডবল। জাতীয় আয় বেড়েছে ৪২%, ১০০, ০০০টি নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭ থেকে ৪৬এ দাঁড়িয়েছে। ছাত্র সংখ্যা ৩৬০, ০০০ থেকে ৯০০, ০০০ বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ২, ৩০০, ০০০ থেকে ৫, ৭০০, ০০০ কিলো ওয়াট্।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হবে ১১, ৬০০ কোটী টাকা। তার ফলে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ৭০%, কৃষি ২৫%, জাতীয় আয় বাড়বে ৩৪%, মাথা পিছু আয়ু বাড়বে বত্রিশ থেকে আরও চার বছর বেশী। খাদ্যে ক্যালরি বাড়বে ২, ১০০ থেকে ২, ৩০০ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথা পিছু ক্যালারি ৩০০০)।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সব চেয়ে বড় বাধা হল আমাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের জনসংখ্যা ১৯৬৬ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বেড়ে হবে ৪৯ কোটি ২০ লক্ষ। লোক সংখ্যা যাতে অধিক বৃদ্ধি না হয় তার প্রতিকার জন্মনিয়ন্ত্রণের দরুন তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকীতে ব্যয় করা হবে সাড়ে পঞ্চাশ কোটী টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা কৃতকার্য হলে মাথাপিছু জাতীয় আয় হবে ৮১ ডলার (ডলার=পাঁচ টাকা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথা পিছু জাতীয় আয় ৭০০ ডলার।)

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদেশী ঋণ পাওয়া যাবে ২, ২২৫, ০০০,—

০০০ ডলার। তার অধিক আসবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সোভিয়েট রাশিয়া দেবে ৫০০, ০০০, ০০০ ডলার। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের রাজস্বে যা আয় হয় তার শতকরা ৬০% ভাগ যায় প্রতিরক্ষা খাতে। পাকিস্তান ও চীনের অতখানি ব্যয় নেই। পাকিস্তানে ব্যয় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চীনে সাহায্য করে সোভিয়েট রাশিয়া। আমাদের এই ব্যয় শিল্পোন্নয়নে করা হলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হত আরও দ্রুত।

ভারতের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক পন্থায়। ভারতের শাসনতন্ত্রও অতিআধুনিক। যেকোনো উন্নত দেশের শাসনতন্ত্রের সাথে তার তুলনা করা চলতে পারে। কিন্তু আমাদের সামাজিক পরিবর্তন কি সেই পঞ্চবার্ষিকী বা শাসনতন্ত্রের হারে হচ্ছে? আমরা সনাতন ধর্ম ও সমাজের পক্ষপাতী। সনাতন মানে যা চলছে সেই ভাবে চলুক। আমাদের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র নৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে আধুনিক মতে কিন্তু সমাজের পরিবর্তন সেই অনুপাতে হচ্ছে না। এ সম্পর্কে সর্দ্দার কে, এম, পানিক্কর তাঁর সোস্যাল প্রবলেম। '(১৯৫৫)'-এ লিখেছেন যে, আমাদের রাষ্ট্রিক কাঠামো আর শাসনতন্ত্র আধুনিক। কিন্তু সেই আমাদের সামাজিক চিত্র অতি পুরাতন। কি করে সম্ভব অতি আধুনিক রাষ্ট্রে পুরাতন ব্যবস্থার রীতিনীতি। কথাগুলো সবারই ভেবে দেখা অতি প্রয়োজন। নইলে আমাদের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতি চলবে ঢিমে তেতালায়। তাহলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট ইউনিয়ন তো দূরে কথা আমাদের পাশের বাড়ী চীনের চেয়েও অনেক পেছনে পড়ে থাকব। কারণ সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় যন্ত্রশিল্প, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি হতে পারে না। তার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বাধীনতার পরে চৌদ্দ বছরের খতিয়ান।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত দিচ্ছি।

•১। বৈদিক যুগের বহু পূর্বে মহেঞ্জোদারো ও (হরপ্পা খৃষ্টপূর্ব

৩০০০) সভ্যতার কালে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অতি সামান্যই জানা যায়।[১২]

২। বৈদিক যুগ (খৃষ্টপূর্ব ২০০০)।[১৩] সে যুগে সমাজ ব্যবস্থা ছুঁৎমার্গ, খাদ্যাখাদ্যের বিচার একালের মতন ছিল না। বরং সে যুগে সবরকমের মাংস খাওয়া চলত। মেয়েরা পুরুষের মতন সমানাধিকার পেত। বিবাহে জাতপাঁতের বাদবিচার ছিল না।

৩। মনু ও কৌটিল্যের যুগ। মনু লিখিত মনুসংহিতার বয়স সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৫০০।[১৪] বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি, জাতপাঁতের বিচার সুরু হল। হল মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। তখনও কিন্তু মনুর মতে সবাই চলত না। মনুর মতকে সরকারী ভাবে চালাতে সুরু করলেন কৌটিল্য (খৃষ্ট পূর্ব ৩২৫)। কৌটিল্য ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও মনুসংহিতার কথাই পাওয়া যায়।[১৫]

৪। বৌদ্ধ যুগ (খৃষ্ট পূর্ব ৫৬৬ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দে)। মনু প্রচারিত সমাজনীতির বিরুদ্ধেই বুদ্ধের আদর্শ প্রচার। বুদ্ধ (খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬) থেকে সম্রাট অশোক (খৃষ্ট পূর্ব ২৩২) পর্যন্ত চলে মনু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সম্রাট অশোকের সময়ে ও তার পরবর্তীকাল পর্যন্ত চলে উদার সমাজনীতি। যাতে জাত বা খাদ্যের নিষেধ ছিল না।

তারপর গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে (২৩০ হতে ৭০০ খৃষ্টাব্দ) সমাজ ব্যবহার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বরং পুরানো মনুর মতই প্রচলিত হল এবং তার প্রচার করলেন শংকর (৮০০ খৃষ্টাব্দ)।

৫। মুসলমান রাজত্ব (১২০০ থেকে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ)। মুসলমান রাজত্ব চলে একাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

---

(১২) আর, সি মজুমদার, রায়চৌধুরী, দত্ত—এ্যাডভানস হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া (১৯৫৮) পৃঃ ১৫

(১৩) ঐ পৃঃ ২৯

একমাত্র আকবর (১৫৬০ থেকে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দ) কিছু নতুন সমাজ-ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খুব বেশী দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন নি।

মুসলমান রাজত্ব কালেই সুরু হয় কৌলিন্য প্রথা (ষষ্ঠদশ শতাব্দী)। অর্থাৎ যে কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান আট-দশটা বিয়ে করতে পারত।

মুসলমানদের পরে এলো বৃটিশরা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন ইউরোপীয়দের উপনিবেশ সুরু হল ঠিক তখন থেকে ভারতে অতি ক্ষীণ ভাবে আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন সুরু হল। অবশ্য ইংরেজরা আমাদের পুরোনো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে নি। নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন ভারতীয় সমাজ সংস্কারক অগ্রদূতেরা। তাদের পুরোধা হলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সহায়তায় (১৮১৬-৩০ খৃষ্টাব্দ) সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। তারপর প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ।

১৮৫০। বর্ণাশ্রম প্রথা নিরোধক আইন।

১৮৫০। মুসলমানদের ওহাবি আন্দোলন।

১৮৫৬। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ আইন।

১৮৭২। বিশেষ বিবাহ আইন

১৮৭৬। দয়ানন্দ প্রবর্তিত আর্য সমাজ।

১৮৯৭। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন।

১৯২৩। নতুন আইনে হিন্দুদের মধ্যে জাতনির্বিশেষে বিবাহের সুযোগ।

১৯৪৭। ভারতের স্বাধীনতা।

১৯৫০। সাধারণতন্ত্র।

১৯৫০। কৃষি ও গ্রামোন্নয়ণ কল্পে 'কম্যুনিটি প্রজেক্ট' ব্যবস্থা।

---

(১৪) ঐ পৃঃ ৪৫

(১৫) ঐ পৃঃ ৯৭

১৯৫১। জন্মনিয়ন্ত্রণ কল্পে ভারত সরকারের প্রচার কার্য।

১৯৫২। নতুন বিবাহ আইন।

১৯৫২। গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন।

১৯৫৩। অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন।

১৯৫৪। বিশেষ বিবাহ আইন।

১৯৫৫। নতুন বিবাহ আইনের বিস্তৃতি লাভ।

১৯৫৯। পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন।

স্বাধীনতার পর অনেক আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আইনই পুঁথিগত। তারা বইএর মধ্যেই চাপা পড়ে আছে। রাষ্ট্র নেতারা ও জনসাধারণ সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী না হলে যথা পূর্বং তথা পরং হয়ে থাকবে।

সমাজ ও ধনবিজ্ঞানে জরীপ

জরীপ বলতে আমরা জমি-জমার জরীপই বুঝি। কিন্তু আজকাল জমি-জমার জরীপ ছাড়াও মনুষ্যতত্ত্বে জরীপ, সমাজ ও ধনবিজ্ঞানে জরীপ প্রায়শই হচ্ছে। সমাজ ও ধনবিজ্ঞানে জরীপ অন্যান্য জরীপের মত এক নয়। এই জরীপের মূল্য ভিন্ন। জমি-জমার জরীপ এই সমাজ-ধনবিজ্ঞান জরীপের অন্তর্ভুক্ত। এখনকার দিনে জনসাধারণের মতামতই হচ্ছে সমাজ ধন বিজ্ঞান জরীপের প্রধান ভিত্তি।

সে যুগ চলে গেছে যখন শুধু মাত্র কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হত। এখন জনসাধারণের ইচ্ছায় কর্ম হচ্ছে। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা জনসাধারণের মতামতের ওপর নির্ভর করেই সমাজের রোগগুলোকে চট্ করে ধরতে পারছেন। আর গভর্ণমেন্টের কাজ হচ্ছে সেগুলোর সমাধান করা।

সুতরাং সেই মতামত গ্রহণ করা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সমগ্র দেশের জনসাধারণের মতামত সব সময়ে গ্রহণ করে কাজ চালানো সময় সাপেক্ষ। তাই বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানের সমষ্টিগত জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করা সহজ সাধ্য। এই নির্ধারিত জায়গার সমষ্টিগত জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করাকে বলে নমুনামূলক জরীপ বা সমীক্ষা। সংখ্যা বিজ্ঞানে এ জিনিসটি 'স্যাম্পল সারভে' নামে পরিচিত। এই নমুনা জরীপ আমেরিকায় 'গ্যালপ ঝোল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ডক্টর গ্যালপ জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করে সংখ্যাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে জনসাধারণের গতাগতির হিসেব নিয়ে থাকেন। এতে করে অতি অল্প সময়ে একটা আন্দাজ করে নেওয়া যায় রাজনৈতিক ভোটের সময় কে জিতবে বা হারবে বা

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কে কোন বিষয়ে লোকপ্রিয়তা অর্জন করছে বা করছে না।

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মাণীর কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ সমাজবিজ্ঞানের জরীপ করে এক মজার তথ্য প্রকাশ করেছেন।

এই সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ পনর'শ নর-নারীর মতামত গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে জীবিকা বা পেশার পরিবর্তন। জনসাধারণ কোন ধবণের জীবিকা বা পেশাকে বেশী পছন্দ কবে। বা কোন পেশাকে উঁচু স্থান দেন। যে সমস্ত নর-নারীর মতামত নেওয়া হয়েছিল তাদের বলা হয়েছিল যে তাদের ইচ্ছামত আটত্রিশটি জীবিকা বা পেশাকে প্রথম থেকে আট ত্রশতম স্থান দিয়ে সাজিয়ে যেতে। এই পনর'শ নরনারীর মধ্যে ছিল বড় সহরের অধিবাসী যাদের বয়স বিশ-এর ওপর, গ্রামের অধিবাসী ও কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

এই মতামতের জরীপ থেকে জানা গেছে যে প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজকে প্রথম স্থানের জন্য ভোট দিয়েছে। তারপর যে সমস্ত স্থান অধিকার করেছে, চিকিৎসক, কারখানার ডিরেক্টর, জমিদার, শিক্ষক, ধর্মযাজক, এঞ্জিনিয়ার ও সঙ্গীতজ্ঞ।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে জার্মানীর "আই-সি-এস" রাজ কর্মচারীরা একাদশতম স্থান অধিকার করেছে। সবার নীচে যে সব পেশা স্থান লাভ করেছে তাদের মধ্যে রাজ মিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, কশাই, দর্জি আর এদের নীচে স্থান পেয়েছে বীমার দালাল ও পিয়ন। এই ধরণের জরীপকেই বলা হয়ে থাকে সমাজ ধন-বিজ্ঞানের জরীপ।

সম্প্রতি কলকাতার বিখ্যাত সমাজ ও ধনবিজ্ঞানের গবেষণা পরিষদ বিনয় সরকার একাডেমীর তরফ থেকে এক সমাজ-ধনবিজ্ঞান জরীপ করা হয়েছে। জরীপ করেছেন এই প্রবন্ধের লেখক। উত্তর

কলকাতার গোয়াবাগান বস্তীর সমাজ-ধনবিজ্ঞানের জরীপ থেকে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানা গেছে—যা সমাজবিজ্ঞানের গবেষকদের পক্ষে মূল্যবান বলে মনে হবে।

এই বস্তীটির আয়তন প্রায় ২৫০ × ৫০ বর্গগজ। লোকবসতির সংখ্যা প্রায় আট হাজার। এক তলা খোলার ঘরের সংখ্যা ১২০টি। এক এক বাড়ীতে গড়ে দশটি করে ঘর। এক এক ঘরে পাঁচ থেকে দশজন বাস করে। পরিস্রুত জলের কলের সংখ্যা মাত্র বত্রিশটি। পায়খানা ২৫টি। এই প্রবন্ধের লেখক দেড়শ পরিবারের মতামত গ্রহণ করেছেন। এক এক পরিবারের সভ্য সংখ্যা গড়পড়তা পাঁচ থেকে ছজন। মতামতের জন্য নয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাসস্থান, নালা নর্দমার পরিচ্ছন্নতা, রোগ সম্বন্ধে মতামত বা কোন ধরণের চিকিৎসা তারা গ্রহণ করে থাকেন, খাদ্য ও খাদ্যের পুষ্টিকারিতা, প্রসূতি স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মতামত, বয়স্ক ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

প্রথমে সমগ্র কলকাতা ও হাওড়ার বস্তীসমূহের অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যাক।

কলকাতার বস্তিসমূহের শতকরা ৬১৭টি বাড়ীতে এবং হাওড়ার শতকরা ৮৩৬টি বাড়ীতে জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা নাই কলিকাতার বস্তিসমূহের শতকরা ১৭·৩টি বাড়ীতে এবং হাওড়ার শতকরা ১৫·৫টি বাড়ীতে কোন পায়খানা নাই। কলকাতার বস্তির শতকরা ৪২টি এবং হাওড়ার শতকরা ৩৪টি পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। কলকাতা ও হাওড়ার শতকরা মাত্র ১৫টি বাড়ীতে রান্না ঘরের ব্যবস্থা আছে।

মিউনিসিপ্যালিটির হিসাব অনুসারে কলিকাতার চার হাজার তিন শ একটি এবং হাওড়ায় এক শ একটি বস্তি আছে। এই সব বস্তির অধিবাসীদের অর্থোপার্জ্জনের নানা রকম পন্থা আছে তাদের মধ্যে কারুর হয়ত মাসে এক পয়সাও রোজগার হয় না

আবার কারুর মাসিক দু'হাজার টাকা পর্যন্ত আয় আছে। এই মোটা আয়ের লোকেরা কলকাতায় স্থানাভাব অথবা অভ্যস্ত পরিবেশের দরুণ বস্তিতে বাস করে থাকেন।

কলকাতার বস্তিগুলো শতকরা ৩৭টাতে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা সন্তোষজনক, শতকরা ৩৯টিতে ব্যবস্থা মোটামুটি ও অবশিষ্ট ২৪টির ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই গেল সমগ্র কলকাতা ও হাওড়ার বস্তিসমূহের এক ক্ষুদ্র বিবরণী।

আমাদের গোয়াবাগান বস্তির সমাজ ধনবিজ্ঞান জরীপের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। যে দেড়'শ পরিবারের মতামত নেওয়া হয়েছে সেই দেড়শ পরিবারের প্রধান কর্তাদের জীবিকা বা পেশা সম্পর্কে অনুসন্ধান নেওয়া যাক। দেখা গেছে এক এক পরিবারে সভ্য সংখ্যা আট থেকে দশ জন কিন্তু সমস্ত সংসারের খরচ একজনের কাজের উপর নির্ভর করে। আবার কোন কোন পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা সবাই রোজকার করে থাকে। এদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

এই দেড়শ পরিবারের সাধারণতঃ একজন করে রোজকার করে থাকে আর তাদের জীবিকা বা পেশার নিম্নোক্ত শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। ছোটদের ব্যবসায়ী শতকরা ১৩ জন, দোকানদার কর্মচারী শতকরা ৭ জন, কারখানা কর্মী শতকরা ১৫ জন, দৈনিক মজুর শতকরা ১৩ জন, নানান ধরণের দেশের লোক রাজ মিস্ত্রী, ছুতার, শিক্ষক ও অফিসের কর্মচারী এদের সংখ্যা শতকরা ৫২ জন। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করে এই পাওয়া গেছে। শতকরা ৫৫টি পরিবারের একখানা করে ঘর, আর শতকরা ১৫টি পরিবারের দুটোর বেশী ঘর আছে।

শতকরা ৫৪টি পরিবারের সভ্য সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ আর শতকরা ৪৬টি পরিবারের সভ্য সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত।

এই সব পরিবারের মধ্যে শতকরা ত্রিশ জন বেকার এবং ন্যূন পক্ষে আয় হচ্ছে মাসে ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা। একশ

টাকার ওপরে যে সব পরিবারের আয় তাদের সংখ্যা শতকরা ১৫ জন।

এই সব পরিবাবকে বিভিন্ন প্রশ্নের মতামত চাওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে নালা-নর্দমার পবিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতার ও অন্যান্য মতামত এই। শতকবা ৫২টি পরিবারের নালা নর্দমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। শতকরা ৪৮টি পরিবারের নালা-নর্দমা কিছুটা ভাল। শতকরা ৮৫টি টিকা নেওয়ার পক্ষে আর শতকরা ১৫টি পরিবার টিকার বিপক্ষে। শতকরা ৫৭টি পরিবার আধুনিক ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে, শতকরা ৩৯টি পরিবার হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার পক্ষপাতি আর শতকবা ৪টি পরিবার গ্রাম্য টোটকা চিকিৎসার পক্ষপাতি। এই সব পরিবারকে বর্তমান খাদ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শতকরা ০৮টি পরিবারই বলেন তারা প্রত্যহ অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন।

শতকরা ৭২টি পরিবারই আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকের জন্যে হাসপাতালের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন, বাড়ীতে গ্রাম্য প্রথায় প্রসূতির চিকিৎসা করে থাকে শতকরা ৮টি পরিবার। এই সব পরিবারের শতকরা ৫০জন পুরুষ ও কয়েকজন স্ত্রীলোক জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে, শতকরা ১৫জন জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে আর শতকরা ৩৫ জনের জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। এই সব পরিবারের গৃহ-স্বামীদের মধ্যে শতকরা ৫৮ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত আর শতকরা ২৪ জন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত শতকরা ১৮ জন কোনো বিদ্যালয়েই যাননি।

এই সমাজ-ধনবিজ্ঞান জরীপ থেকে গোয়াবাগান বস্তির অধিবাসীদের মতামতের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তা থেকে সমগ্র বস্তির বর্তমান অবস্থা অতি সহজেই অনুমান করা যায় না কি? এরই নাম নমুনা স্বরূপ সমাজ-ধন বিজ্ঞানের জরীপ।

এই নমুনা জরীপ থেকে সরকারী কিম্বা বে-সরকারী যে কোনো প্রাতষ্ঠান বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই বস্তিটির কিম্বা কলকাতার অন্যান্য

বস্তির সমস্যাগুলো নিয়ে যথাযথ বিধি ব্যবস্থা করতে পারেন অতি সহজেই। এতে আন্দাজে ঢিল মারার কোনো প্রয়োজন হয় না। শুধু একটি বস্তির অধিবাসীদের নমুনা স্বরূপ মতামত না নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে আরও বেশী বস্তির অধিবাসীদের মতামত নিয়ে কলকাতা বস্তিগুলোর উন্নয়ন অতি সহজেই হইতে পারে।

গোয়াবাগান "বস্তির উন্নয়ন সমিতি'র নেতা ও কর্মীদের প্রচেষ্টায় গত চার বছরে কি রকম উন্নতি হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই ছবিগুলো থেকে। অন্যান্য অনেক বস্তি থেকে এ বস্তি অনেক পরিষ্কার। এই বস্তির উন্নয়ন সমিতি অনেক প্রকার জন হিতকর কাজ চালিয়ে যাচ্চেন। তা প্রশংসনীয়।

রোগ ও সমাজ বিজ্ঞান

রোগে ভোগেনি এমন লোকের সংখ্যা অতি বিরল। কথায় বলে, শরীরই হচ্ছে রোগের আধার, সুতরাং রোগ হবেই। দেহ আছে বলেই রোগ, সুতরাং হাত গুটিয়ে বসে থাকার দিন চলে গেছে অনেক দিন আগেই।

এখন নানান দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই যুক্তিতে এসেছেন যে, যথাসময়ে যে কোন রোগের চিকিৎসা হলে সেই রোগ সেরে যেতে বাধ্য। অবশ্য কতকগুলো রোগের কথা ভিন্ন। যে দিন আর নেই যখন চিকিৎসকেরা শুধু ঔষধ খাইয়ে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করতেন। এখন বিজ্ঞানীরা হয়েছেন সমাজ সচেতন। শুধু দৈহিক দুর্বলতার জন্য বাইরের জীবাণুর আক্রমণে আক্রান্ত না হয়েও অনেক সময়ে হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রতিদিন। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে চিকিৎসকেরাই জানতে পেরেছেন যে, শুধু দৈহিক দোষে নয় মানসিক ও সামাজিক কারণে অনেক রোগ প্রতিদিন আক্রমণ-চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিবাদে। এছাড়াও আজকাল বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকেরা ব্যক্তিগত চিকিৎসার পরিবর্তে সমষ্টিগত চিকিৎসার পক্ষপাতি। শুধুমাত্র একজন কি দুজনকে নিয়ে কোন রোগের অনুসন্ধান না চালিয়ে সমাজের কোন আনাচে-কানাচেতে রোগের উৎস তা বের করার প্রচেষ্টায় আছেন সব দেশের চিকিৎসক ও সমাজ বিজ্ঞানীর দল।

রাষ্ট্র-শাসনের দিক দিয়েও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে প্রায় সব দেশের সরকার। কোন কোন সমাজের কোন অন্ধকার গাল দিয়ে বীভৎস সব রোগ প্রবেশ করছে এবং সেই সমাজকে

কি ভাবে পঙ্গু করছে তার হিসেব যদি সরকারের হাতে থাকে তাহলে অতি সহজেই তার একটা ব্যবস্থা করা অতি সহজ হয়ে উঠে না কি? তাই নতুন পদ্ধতির কাজ এগিয়ে দেয় সমাজ বিজ্ঞান।

সমাজ-বিজ্ঞানেরও সে যুগ চলে গেছে যখন এর সীমা ছিল কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিতদের দর্শন চর্চার মধ্যে আবদ্ধ। এখন সমাজ-বিজ্ঞান হয়েছে ফলিত বিজ্ঞান। অন্যান্য ফলিত বিজ্ঞানের মতনই এর কাজ চলেছে কতকগুলো দেশে। মানুষের সাথে যে সব জিনিস বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সেগুলো সমাজ-বিজ্ঞানের অংশ বিশেষ। বর্তমান কালের লিওপোল্ড কোন বীজের মতবাদ সমাজ-বিজ্ঞানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে এই ধরণের 'সমাজ'। এই মতিগতি আমেরিকায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আর তা'ছাড়া এই সময়ে জগতের প্রায় সমস্ত সমাজ-বিজ্ঞানীরাই এই ধরণের সমাজবিজ্ঞান গ্রহণ করেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ বিজ্ঞানীরা তারিফ পাবার যোগ্য। তাঁরা নরমও না, চরমও না। এঁরা দল নির্বিশেষে আলোচনা চালান। এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে খাদ্যতত্ত্ব ও রোগ সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ কার্যকরী।

সুতরাং দেশে যখন রোগ দিন দিন শুধু বেড়েই যায় তখন সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করলে চট্ করে রোগ নিরুপণ সহজ হয়। ডাক্তারি মতে যেমন আগে রোগ ধরা পড়লে তার পর রাসায়নিক, জৈবিক কি উদ্ভিজ্জ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা চলে তেমনি সমাজ-বিজ্ঞানের ও সমাজের ভেতর থেকে রোগের চিহ্ন ধরতে পারার পর তার চিকিৎসার নির্দেশ দিতে পারে অতি সহজে। অনেকটা আশ্চর্য লাগতে পারে আপনাদের কাছে। কিন্তু এ ধরণের চিকিৎসা কয়েকটা দেশে বেশ সফল হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার ফলে সে দেশের সরকার অতি সহজে ভীষণ রকমের বিপদের হাত থেকে রক্ষাও পেয়েছে অনেক কম সময়ের মধ্যে। —

এখন আমাদের দেশের কথাই বলা যাক। পশ্চিমবঙ্গে কতকগুলো মারাত্মক রোগ গত দশ বছর ধরে ধাপের পর ধাপ উপরে উঠে চলেছে বিনা বাধায়। এই রোগগুলো মারাত্মক তো বটেই এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও পঙ্গু করে দিচ্ছে। অবশ্য আমরা এখনো সম্পূর্ণ টের পাই না কারণ মানুষের দেহ তো না, এ সমাজের দেহ। সম্পূর্ণ টের পেতে এখনো বছর বিশেক সময় লাগবে। সমাজের কাছে বিশ বছর কিছু নয়। ব্যক্তিগত জীবনে বিশ বছর অনেক দিন।

এই সব মাবাত্মক রোগগুলোর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আর দ্বিতীয় কারণ আমাদের সমাজের অদ্ভুত সামাজিক নিয়ম-কানুন।

বাংলা দেশে বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৭৭০, ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৯২, ১৮৯৭ আর ১৯৪৩ সালের চিরস্মরণীয় দুর্ভিক্ষ। এই রকম এক একটা দুর্ভিক্ষ এসেছে আর সমাজের শিড়দাড়া ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। রোগ ঢুকেছে অনায়াসে বিনা-বাধায়। তার ফল ভোগ করছে এখনকার বাঙালী সমাজ। এতো গেল দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ হল গত পঞ্চাশ বছরে দুবার। তারপর এলো বিভক্ত বাঙলার উদ্বাস্তুদের পদক্ষেপে।

এইসব মিলে বাঙালী সমাজে 'নরক-গুলজার' করে তুলেছে মারাত্মক রোগগুলো। দেখা গেছে যে, এখন প্রায় প্রতি তিনটি পরিবারে একটি করে টি বি রোগী। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি যৌন রোগ সম্বন্ধে অবিভক্ত বাঙ্গলায় ১৯৪৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ২,৭১,৫২৬ কিন্তু বিভক্ত পশ্চিম বাঙ্গলায় ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে এর সংখ্যা হচ্ছে ১,৭৬,০৪৩ আর ২,২৫ ৯১৪। সুতরাং এর থেকেই কি যথেষ্ট বলা যায় না যে মারাত্মক রোগগুলো কি ভাবে বেড়ে চলেছে। আর উপরে লিখিত রোগগুলো সমাজের অদ্ভুত নিয়ম

ও অবিচারের জন্যে হয়ে থাকে। সুতরাং সমাজের দায়িত্ব এই রোগটার ওপর বিশেষ করে প্রযোজ্য। কলেরা বসন্তর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানের দায়িত্ব সমাজের ওপর অত্যন্ত বেশী রকমের। একমাত্র সরকারই সমাজ-বিজ্ঞানের সাহায্যে এর একটা বিহিত করতে পারেন সহজ উপায়ে। নইলে ভবিষ্যৎ আপনাদের ওপর রইল পড়ে।

যুদ্ধ ও সমাজ বিজ্ঞান

যুদ্ধ আর শান্তি একই পদার্থের এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। যুদ্ধের সময় দেশশুদ্ধ সবাই শান্তিবাদীদের সাথে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠেন, 'শান্তি চাই—যুদ্ধ নয়।'

তেমনি শান্তির সময় যুদ্ধোন্মাদদের প্রচেষ্টায় আবার ভয়ঙ্কর দিনের প্রস্তুতি চলতে থাকে পুরোদমে। এই সমস্ত যুদ্ধোন্মাদদের পেছনে যদি দেশের জনসাধারণের পুরোপুরি না হক, আংশিক সমর্থন না থাকে, তা হলে তারাই বা একটা ভয়ঙ্কর রকমের রক্তপাতের সূচনা করে কি করে। এটা একবার তলিয়ে বোঝা একান্ত প্রয়োজন। বৃটিশ কূটনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি বলেছেন, "যুদ্ধপ্রস্তুতির কাঠামোটা তৈরী করে থাকে একমাত্র শান্তিই।"

সবদেশের সবাই যুদ্ধের সময় শান্তির চিন্তা আর শান্তির সময় যুদ্ধের চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকেন। কিন্তু শান্তির চেয়ে যুদ্ধকালীন অবস্থাগুলোই মানুষের মনে বেশী দাগ কেটে যায়। কারণ সুখের চেয়ে দুঃখের দিনগুলোই মানুষের মনে বেশী দিন স্থায়ী হয়। যতই দিন এগুচ্ছে যুদ্ধের রূপও যেন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। অনেকদিন আগে যুদ্ধ হত (মারা-মারি বলা যেতে পারে) এক পরিবারের সাথে আর এক পরিবারের। তারপর শুরু হল গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর; এক সম্প্রদায়ের সাথে আর এক সম্প্রদায়ের, জাতির সাথে জাতির, এক জেলার সাথে আর এক জেলার, এক প্রদেশ-এর সাথে আর এক প্রদেশের, এক দেশের সাথে আর এক দেশের, এক মহাদেশের সাথে আর এক মহাদেশের—শেষে আরম্ভ হল জগৎজোড়া যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এক এ্যাটম বোমার নামেই সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। এবার কিন্তু সেই এ্যাটম বোমাই হয়ে গেল

অপাংক্তেয়। এখন সব সভ্য দেশই নাকি এ্যাটম বোমা তৈরী করছে। তাই হাইড্রোজেন বোমার আবির্ভাব হল। হাইড্রোজেন বোমার শক্তি নাকি এ্যাটম বোমার চেয়ে একশ' গুণ বেশী—বলেছেন বৈজ্ঞানিকেরা। এই হাইড্রোজেন বোমার কদরও কমে যাচ্ছে—কারণ, এটা এখন আর শুধু মাত্র একটা দেশেরই সম্পত্তি নয়। আরও অনেকগুলো দেশের অনেকগুলো হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। বছর বার-তের আগে কোন এক বাঙালী চিন্তাশীলের চিন্তায় ছিল যে, ভবিষ্যতের যুদ্ধে আকাশময় একরকম বৈদ্যুতিক জ্বালার সৃষ্টি হতে পারে যাতে একটা দেশের বেশ বিস্তৃত পরিমাণ জায়গা জ্বলেপুড়ে যাবে। তাতে বোমা ফেলার প্রয়োজন হবে না। এখন কিন্তু তাই হতে চলেছে কয়েকটি দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায়। মানুষ ধ্বংসের সব রকম প্রচেষ্টায় যখন সাফল্য লাভ করেছে তখন এটাও যে কৃতকার্যের চরম শিখরে উঠবে না, তা কে বলতে পারে।

যাই হোক, যুদ্ধের শেষে আমরা শুধু আর্থিক ক্ষতির খতিয়ানই করি। সামাজিক ক্ষতির পরিমাণগুলো হিসেবের মধ্যে ধরি না।

যুদ্ধের ফলে সমাজের যে কি রকম ক্ষতি হয়, তা আমরা দেখেও দেখি না। অন্য দেশের কথা ত দূরের কথা, আমাদের দেশের কথাই ধরি না কেন! গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে কি আমাদের সমাজে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি? যুদ্ধের ফলেই দুর্ভিক্ষ। তাতে একমাত্র বাংলা দেশেই পঞ্চাশ লাখ লোক তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছে। আর বাকি লোকেরা আধমরা বা সিকিমরা অবস্থায় সেদিন থেকে কোনো রকমে ধুকছে। গ্রামের লোক সহরে এসেছে। সহরের লোক গ্রামে গেছে। কৃষিকর্মের লোকের যন্ত্রশিল্পে কাজ করতে হয়েছে। বড় বড় পরিবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়েছে।

পুরানো কৃষি-সভ্যতার বেড়া ভেঙ্গে যন্ত্র সভ্যতার ইমারতের তলায় অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। তার ফলে কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতিও

হয়েছে; সেই সাথে সামাজিক উন্নতিও। কারণ আর্থিক উন্নতির সাথে সাথেই সামাজিক উন্নতিও ঘটে থাকে। আমাদের দেশ সোজাসুজিভাবে যুদ্ধের সংস্পর্শে আসেনি বলে সামাজিক গণ্ডগোলগুলো বেশীরকম জট পাকাতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার সমাজগুলো যুদ্ধের ফলে বেশী রকম সামাজিক অসাম্যের যন্ত্রণায় এখনো ভুগছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক মৃত্যু হয়েছে জার্মান, জাপান, ইতালির পঞ্চান্ন লক্ষ আর ইংরেজ আমেরিকান, রুশদের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। অ-সামরিক মৃত্যুর সংখ্যা ধরাই হয়নি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত জার্মানিতে সমগ্র লোক সংখ্যায় পাঁচ লাখ নারী উদ্বৃত্ত—জাপানে বিশ লাখ নারী পুরুষের তুলনায় বেশী, ইংল্যাণ্ডে পৌনে তিন লাখ নারী পুরুষের তুলনায় বেশী। আরও অনেক দেশ আছে যাদের হিসেব দিলে ধাঁধার সৃষ্টি করবে; সুতরাং এইগুলো হচ্ছে সামাজিক অ-সাম্যের এক-একটা খুঁটি।

অনেকগুলো সামাজিক রোগ আছে, যুদ্ধের সময় যাদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। যুদ্ধ যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন বোঝা যায়, সে রোগগুলোর কার্যক্ষমতা। তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও যৌন-অপরাধ। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতি হাজারে দুটো করে, ১৯৪৫ সালে সেটা বর্ধিত হয়ে দাঁড়ায় ৩·৬ হারে, আর ১৯৪৫ সালে ৪·৩-এ।

যৌন-অপরাধ নানান রকমের হতে পারে। তাদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি হচ্ছে অন্যতম। আমাদের কলকাতার উদাহরণই ধরা যাক না কেন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতার বেশ্যাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। যুদ্ধের শেষে এর সংখ্যা বর্ধিত হয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, অনেক পরিবারে মৈত্রীবন্ধন টুটে গিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

যুদ্ধ যেমন ধ্বংসের কারণ, তেমনি আবার সৃষ্টিও করে অনেক কিছু। আমাদের দেশে আগে অনেক কিছুই পাওয়া যেত না—

যুদ্ধ লাগার সাথে সাথেই আমরা তার অভাব অনুভব করি। তাই নতুন নতুন কারখানায় অনেক কিছুই তৈরী হয়। শত্রু পক্ষকে ধ্বংস করবার জন্যে ইংরেজ-আমেরিকানরা তাদের নিজের স্বার্থে আমাদের দেশে অনেক যন্ত্র-শিল্পের কারখানা খোলে। অবশ্য আমাদের প্রয়োজনের খাতিরে নয়। নতুন নতুন যন্ত্র চালাবার কৌশল-গুলোও শিখেছেন অনেকে। যদিও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলো কিছু নয়। এই সব নতুন নতুন যন্ত্রশিল্প চালু হওয়ার জন্যে দেশের অনেকেই দু' পয়সা রোজগারের পথ দেখেছেন। আগের চেয়ে কিছু বেশী টাকা তাঁরা উপার্জন করেছেন। তাতে আর্থিক উন্নতির সাথে সামাজিক উন্নতিও হয়েছে অনেকটা। এটা কিন্তু যুদ্ধের শুভ দান। যুদ্ধের দরুণ ভারতবর্ষ কতকগুলো জিনিসে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। যুদ্ধের আগে কাপড়ের উৎপাদনের পরিসংখ্যা ছিল ১০০, যুদ্ধের সময় সেটা বেড়ে হয় ১১১। চিনির উৎপাদন-পরিসংখ্যা ছিল যুদ্ধের আগে ১০০ কিন্তু যুদ্ধের সময় বেড়ে হয় ১০৯। সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত হয় ষ্টীল। যুদ্ধের আগে ছিল পরিসংখ্যা ১০০ আর যুদ্ধের সময় হয় ১৫১। এই উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটেছে যথেষ্ট ভাবে। তাতে সামাজিক উন্নতি ঘটেছে।

সর্ব শেষ বলতে গেলে বলতে হয় যে, রাজনীতিক আন্দোলন-গুলো শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল যুদ্ধের সময়। কারণ যুদ্ধকে ঘিরেই না সব দেশ তার রাজনৈতিক সুবিধাগুলো ভোগ করে। সব চেয়ে বেশী উপকারে আসে যুদ্ধগুলো পরাধীন জাতিগুলোর কাছে। এক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলেই না আজ ভারতবর্ষ, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশগুলো স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে।

সামাজিক অপরাধ

কবি বলেছেন বিচিত্র এই জগৎ। সত্যিই বিচিত্র নরনারীর সমাবেশে এ জগৎ বিচিত্রতর হয়ে উঠছে দিন দিন। এই বিশ্বে বিচিত্র নর-নারীর মত সমাজও রয়েছে ছড়িয়ে। এই বিচিত্র সমাজকে আমরা অপরাধী সমাজও বলতে পারি; অথবা সমাজের বিচিত্র রোগও বলা চলতে পারে।

ব্যক্তিগত কোনো অপরাধের জন্যে সমাজ তার বিচারের, উপরন্তু শাস্তির ব্যবস্থা করতে কোনো রকমেই অবহেলা করেনি। সে তার সামাজিক নীতির মাপকাঠিতে বিচার করে ব্যক্তিগত অপরাধকে। বিচারালয়ে তাই নিয়ে আবার হয় ভীষণ বাক্‌বিতণ্ডা। কিন্তু সমাজ যে-সব অপরাধ করে, তার বিচার সাধারণতঃ সমাজ করে না—কোন সমাজ তা করতে সাহসও পায় না। এর বিচারের ভার পড়ে রাষ্ট্রের ওপর। তার চেয়েও নিষ্ঠুর বিচার করে থাকে বিপ্লব। এই বিপ্লবের মুখে কোনো সমাজের কোন রকমের অপরাধই মার্জনীয় নয়।

আমরা এই সামাজিক অপরাধকে সমাজের হিষ্টিরিয়া রোগও বলতে পারি।

সামাজিক অপরাধ সব দেশেই অল্প-বিস্তর ঘটে আসছে সেই আদিম যুগ থেকে। কিন্তু সব দেশেই সামাজিক অপরাধ একই ধরণের নয়, বিভিন্ন প্রকারের। আমাদের দেশে যেটাকে বলি সামাজিক অপরাধ, সেটা আবার য়ুরোপে কিম্বা আমেরিকাতে একেবারেই সামাজিক অপরাধ নয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে—চুম্বন। কয়েক বৎসর পুর্বে নাগপুর শহরে এক নবদম্পতি প্রকাশ্য স্থানে চুম্বনের অপরাধে বিচারালয়ে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একে একেবারেই অপরাধ বলে মনে করা হয় না। আমাদের দেশে উপর তলার সমাজের ছেলের সাথে নীচের তলার সমাজের মেয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া মানেই সমাজের তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া এবং তার জন্যে দণ্ড পাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ইহা য়ুরোপে মোটেই সামাজিক অপরাধ নয়। ঠিক তেমনি মুসলমান সমাজে সাধারণতঃ বিয়ের মেয়ের পক্ষ থেকে খুড়তুতো অথবা মামাতো ভাইকেই প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়। এ ধরণের সামাজিক নিয়ম আমাদের মতে অপরাধ।

আমাদের দেশের পার্বত্য জাতিদের মধ্যে বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব এখনো চলছে। এটা তাদের কাছে মোটেই অপরাধ নয়। তিব্বতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আমাদের মত নয়। স্বামী কাজের খোঁজে অন্য জেলায় চলে গেলে স্ত্রী স্বচ্ছন্দে তার উপযুক্ত স্বামী পুনরায় যোগাড় করে নিতে পারে; এতে তাদের কোনোই বাধা নেই। তারা তাদের সমাজের চোখে অপরাধী নয়; কিন্তু আমাদের সমাজের চোখে এটা অপরাধ।

ব্যক্তিগত অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপরাধ-বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে বর্তমান যুগের অপরাধ-বিজ্ঞানের জন্মদাতা ইতালীয় লম্ব্রসোর মতে অপরাধীর সৃষ্টি হয় তার বংশানুক্রমের দোষে। অর্থাৎ সেইসব অপরাধীরা জন্ম হতেই অপরাধী। কিন্তু অপরদিকে ওলন্দাজ অপরাধ-বিজ্ঞানী বংগার-এর মতে অপরাধীর সৃষ্টি হয়ে থাকে সামাজিক পরিবেশে—সমাজের দোষ ও ত্রুটির জন্যে। তাই এই সামাজিক অপরাধের বেলায় বংগারের যুক্তিই প্রযোজ্য। সামাজিক পরিবেশে সমাজের অপরাধ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সামাজিক অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। তবে মোটামুটি কতকগুলো অপরাধ যা আমাদের চোখে পড়ে, তেমন অপরাধ নিয়েই আলোচনা চালান

যেতে পারে। যেমন ধরুন (১) অপরাধী সমাজ, (২) বিবাহ-সমস্যা, (৩) পণপ্রথা, (৪) বিধবা, (৫) বেশ্যাবৃত্তি, (৬) সামাজিক উৎপীড়ন, (৭) জাতি-বিদ্বেষ (৮) শ্রেণী-বিদ্বেষ, (৯) কৌলিন্য প্রথা, (১০) ভিক্ষুক, (১১) বেকার ইত্যাদি। আমাদের সমাজের সমস্যাগুলো প্রথমতঃ বাংলাদেশের তথা ভারতের।

সত্যিই কি আমাদের দেশে সামাজিক অপরাধ দিন দিন বেড়ে চলেছে? বলতে গেলে তাই। কোনো কোনো দিকে হয়তো কমেছে, কিন্তু সার্বজনিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখতে পাবো, সমাজের অপরাধ বাড়ছে। যুরোপে আবার সেদিক দিয়ে কমছে।

আমাদের দেশে শতকরা ত্রিশজন অপরাধী এই অপরাধী-সমাজ থেকে এসে থাকে। এই অপরাধী সমাজের লোকেরা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জেলায় নির্দিষ্ট গ্রামে বসবাস করে থাকে। তাদের সেই সমাজের কাজই হল অপরাধ করা। তারা বছরের পর বছর অপরাধীদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে। এই অপরাধী সমাজগুলো আবার সামাজিক লেন-দেনও চালায় তাদের অনুরূপ অপরাধী সমাজের মধ্যে। কয়েক বছর আগে সিন্ধুতে একটি চোরের গ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই গ্রামের সবাই চোর। এখনো কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে এক একটা ছোট জাতের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তারা বংশানুক্রমে অপরাধ করে আসছে। এ ধরণের অপরাধী সমাজ যে শুধু পার্বত্য জাতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়, উপরন্তু আমাদের হিন্দু-সমাজের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। হিন্দু সমাজের উপর তলার অবহেলার ফলে অত্যন্ত নীচের তলার সমাজ শেষ পর্যন্ত অপরাধী সমাজ বলে পরিচিত হয়। এ হচ্ছে সামাজিক অপরাধগুলোর মধ্যে একটা।

বিবাহ-সমস্যা আমাদের দেশে চিরন্তন ব্যাপার। যুগ যুগ ধরে এই সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বিবাহ-সমস্যা সামাজিক অপরাধের মধ্যে অন্যতম। কারণ, বিবাহ-সমস্যা থেকেই সূত্রপাত

হয়ে থাকে অনেকগুলো অপরাধ। তাদের মধ্যে আবার বেশ্যাবৃত্তি অন্যতম। এই বিবাহ-সমস্যা থেকেই এতগুলো যখন অপরাধের সৃষ্টি, তখন এর জন্যে দায়ী কে? নিশ্চয়ই আমাদের সমাজ, সমাজের নিয়মকানুন। তাদের মধ্যে অনেকগুলো আবার শাখা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পণপ্রথা এদের মধ্যে একটি। অর্থাৎ সমাজ পাত্র-পাত্রীকে অর্থনীতির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। এখানে পাত্র-পাত্রীর বিচার হয় অর্থনীতির মানদণ্ডে।

এর পরেও সমাজের একতলার পাত্রের সাথে দোতলার পাত্রীর অথবা চারতলার পাত্রের সাথে একতলার পাত্রীর বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াটা সমাজের চোখে অপরাধ। এর ফলে শিক্ষিত সমাজে বিবাহ-সমস্যার যে প্রকট রূপ আমরা দিন দিন দেখতে পাচ্ছি, তার বর্ণনা না দেওয়াই ভাল। আমাদের সমাজ মামুলি আইনের জোরে প্রতি বছরে হাজার হাজার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিচ্ছে। কারণ ইউজেনিক্স (সুপ্রজনন শাস্ত্র)-এর মতে সমগোত্রীয় রক্তের আদান-প্রদান চলতে থাকলে শুধু বিকলাঙ্গ ও অপরিপূর্ণ মানব-শরীরের সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। সেদিক দিয়ে ভিন্ন জাত-পাতের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হলে সুস্থ-সবল জাতির রূপ ফুটে উঠত। এদিক দিয়ে পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদের অনেক আগে পৌঁছে গেছে। আমাদের দেশে অবশ্য এই প্রগতি অতি ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গের অসবর্ণ বিবাহের হিসেব নিলেই যথেষ্ট হবে। ১৯৪৬ সালে সমগ্র বাংলায় রেজিষ্ট্রী বিবাহ হত প্রায় ৫৪০টি। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫১১টি রেজেষ্ট্রী বিবাহ হয় এবং ১৯৪৮ সালে এর সংখ্যা হয় প্রায় এক হাজার। সম্প্রতি রেজিষ্ট্রী বিবাহ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই বেশী প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে যে ভাবে বিবাহের হার চলছে তাতে এ সংখ্যা একেবারে কয়েক হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক অপরাধগুলোর মধ্যে কতকগুলো অপরাধ একেবারে অসহনীয়। যেমন, কৌলিন্য প্রথা। বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে

সমাজের এক শ্রেণীর খেয়াল-খুশীর বশে এ নিয়ম চলে আসছে আজ পর্যন্ত। কোনো বাধা না পেয়েও আমাদের সমাজের আইনের বলে কোনো বিধবাই পুনরায় বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এই আইনের কোনো বালাই নেই। আমাদের সমাজের এই আইনের বলে শুধু অপরাধীর সৃষ্টিই হচ্ছে প্রতি বছর। সমাজের আইনের বলে প্রতি বছর কতকগুলো করে বিধবা যে শুধু বিধবাই থেকে যাচ্ছে তার হিসেব পাওয়া যাবে এর থেকেই :—

প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায়

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ভারতবর্ষ	১৩৭	১২৪	১৩৮	১১২
বাংলাদেশ	২৪০	২২৪	২৩২	১৫৫

এর থেকেই সমাজের কুৎসিত রোগ পরিষ্কারভাবে ধরা দেয় আমাদের চোখে।

সামাজিক অপরাধ যে দিন দিন ভীষণ বেগে বাড়ছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে শুধু বেশ্যাদের হিসেব নিলে। যুদ্ধের আগে কলকাতায় বেশ্যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র এগার হাজার। যুদ্ধের সময় বিশ থেকে ত্রিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়। আর বর্তমান বছরের (১৯৪৯) হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র কলকাতা শহরে আটহাজার বাড়ীতে ৪০ হাজার বেশ্যা বসবাস করছে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে শতকরা ৭০ জন এ পথে নেমেছে আর সমাজের অবহেলার ফলে ৩০ জন এ পথে এসেছে। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় বেশ্যাদের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার, সেই হিসেবে লণ্ডনে ছিল ৮ হাজার আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে মাত্র ৫ হাজার। য়ুরোপে বেশ্যাবৃত্তি প্রতি বছরে কমে আসছে আর আমাদের দেশে সংখ্যা শুধু বাড়ছে। ১৯৩৯ সালে হাঙ্গেরীয় অপরাধবিজ্ঞানী অধ্যাপক হাক্‌কার তাঁর 'হাণ্ডবুর

টাবুখ্, ড্যর ক্রিমিনোলোগি' নামে জার্মাণ বইতে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বেশ্যাদের সংখ্যা সংক্ষিপ্ত আকারে দেখিয়েছেন :— বেলজিয়ামে ১০০ বেশ্যায় ৩৪৪ জন পুরুষ, ফিনল্যাণ্ডে ১০০ বেশ্যায় ১৮৭১ জন পুরুষ, ইংল্যাণ্ডে ১০০ জন বেশ্যায় ৬৮৬ জন পুরুষ, ফ্রান্সে ১০০ জন বেশ্যায় ৫৪৬ জন পুরুষ, জার্মাণীতে ১০০ বেশ্যায় ৭০৯ জন পুরুষ, এর পর শুধু ইংল্যাণ্ডের বেশ্যা হ্রাসের হিসেব নিলে দেখা যাবে আমরা কোথায়। ১৯১০-১৪ সালে বেশ্যাসংখ্যা ছিল ১০,৬৮২ আর ১৯৩০ সালে সেই সংখ্যা কমে ১,১৬১তে এসে দাঁড়ায়। সেই সংখ্যা ১৯৩৬ সালে বেড়ে ৩,৫৪২ হয়েছিল, তার পর আবার ১৯৩৮ সালে ৩,২৮০তে এসে নামে। তারপর যুদ্ধের সময় ওই সংখ্যা সামান্য বাড়ে। যুদ্ধের পরে আরও কমে গেছে। সেই দিক দিয়ে কি আমরা এগিয়েছি?—মোটেই না। বরং এ ধরণের সামাজিক অপরাধ বেড়েই চলেছে। আরও বাড়বে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে সম্বলহীন অবস্থায় বাস্তুহারার সংখ্যা। তার ওপর আবার বেকারের সংখ্যা লাখ লাখ। এই দুই অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং আমাদের সমাজের মামুলি অপরাধী নিয়ম-কানুন, সমাজের সমস্যা জটিল হতে জটিলতর করে তুলেছে।

আমাদের সামাজিক অপরাধের দরুণ কি ভাবে গোপন যৌনব্যাধি আস্তে আস্তে বাড়ছে তার হিসেব নিলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই ব্যাধিতে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। গত তিন বছরের যৌনব্যাধির হিসেব :—

১৯৪৬—২,৭১,৫২৬ (অবিভক্ত বঙ্গ)
১৯৪৭—১,৭৬,০৪৩
১৯৪৮—২,২৫,৯৪৪

এ পর্যন্ত যে সমস্ত অপরাধ-এর কথা আলোচনা হল সেগুলো প্রকাশ্য। কিন্তু তা ছাড়াও যে বিস্তর অপরাধ ঘটছে প্রতিদিন তার হিসেব নেই। সেই সবের মধ্যে সামাজিক উৎপীড়ন; শ্রেণী-

বিদ্বেষ ও জাতি-বিদ্বেষ অন্যতম। এই সমস্ত বিদ্বেষগুলোর জন্যেই সমাজের বুকে অপরাধের ছাপ পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে।

সামাজিক ব্যবধান ও বৈষম্য, অর্থনৈতিক অবিচারের ও অব্যবস্থার দরুণ প্রতি বছরে আমাদের দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যুদ্ধের আগে সমগ্র ভারতবর্ষে ভিক্ষুকের সংখ্যা চার লাখ ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা চৌদ্দ লাখে পরিণত হয়েছে। একমাত্র কলকাতা শহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা বর্তমানে পনের হাজার। এগুলোকে আমরা অনায়াসে সমাজের রোগ বলতে পারি। এই ধরণের সমস্ত প্রকারের সামাজিক অপরাধ চলতে থাকবে ততদিন, যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে সমাজ সাজা পাচ্ছে অথবা বিপ্লবের ধাক্কায় অপরাধী সমাজ ধ্বংস না হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত সমাজের মধ্যে উঁচু-নীচু শ্রেণীগত ব্যবস্থা না উঠছে ততদিন সামাজিক অপরাধ বেড়েই চলবে। একমাত্র রাষ্ট্রের কড়া শাসনে এই সামাজিক অপরাধের বিনাশ ঘটতে পারে ; নইলে তুষের আগুনের মত জ্বলতে থাকবে।

বিয়ের আগে, অনুরাগে

একটি সামাজিক সমীক্ষা

বিয়ে কি করে হয় ?

আমাদের দেশে এখনো বাপ-মা ও পেশাদার ঘটকদের যুগ অস্তমিত না হলেও ইউরোপ-আমেরিকায় তরুণ-তরুণীরাই প্রধানতঃ নিজেদের স্ত্রী বা স্বামী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্য সমাজে নারী পুরুষের এই পূর্বরাগ ও বিয়ে কিভাবে ঘটে এবং বিরাগের হেতু ও বিচ্ছেদের প্রাবল্য কেন তা নিয়ে দুটি সমীক্ষা ও একটি আলোচনা নীচে দেওয়া গেলো।

কিছুদিন আগে প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক সমাজ-বিজ্ঞানী ডি-এস-সি উপাধি লাভ করেছেন এমন একটি বিষয়ে যা এর আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিট্যুট অব ডেমোগ্রাফির (জনসংখ্যা) এক গবেষক মঁ আলঁ্যা জিরার গত সাত বছর ধরে গবেষণার পর একখানি বই-এ একালের ফরাসী সমাজের চিত্র এঁকেছেন। তাঁর গবেষণার কাজে প্রায় দেড়শত গবেষক দুই হাজার দম্পতীর মতামত গ্রহণ করেছেন। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ফ্রান্সে দাম্পত্য জীবন। কীভাবে এবং কোন পরিবেশে আলাপ পরিচয় হয় ভাবী দম্পতীদের। তাদের বিবাহিত জীবন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে থিসিসে। মঁ জিরার থিসিসে বলা হয়েছে যে, ফরাসী যুবক-যুবতীরা পরিচিত হয় ও পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় সাধারণতঃ নাচের জায়গায় বা হঠাৎ পরিচয়ে। বাপ-মায়ের প্রচেষ্টা বা সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিবাহের কখনো আয়োজন সার্থক হয় না। একালে যুবক-যুবতীরা নিজেরাই বেছে নেয় তাদের ভবিষ্যতের সাথীদের। এই বাছা-

বাছি বা পরিচয়ের সূত্র বা ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সংখ্যানুপাতে কোন্‌টি কোন্‌ স্থানে তার হিসেব দেওয়া গেল :—

কি'ভাবে পরিচয় হয়

বল ডান্সে—শতকরা ১৭ ভাগ

হঠাৎ পরিচয়ে—শতকরা ১৫ ভাগ

বিদ্যালয়ে বা কাজের জায়গায়—শতকরা ১৩ ভাগ

ছেলেবেলার বন্ধুত্ব—শতকরা ১১ ভাগ

তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচয়—শতকরা ১১ ভাগ

বেড়াতে গিয়ে পরিচয়—শতকরা ১০ ভাগ

সম্মেলন ও মিলন সভায়—শতকরা ৬ ভাগ

পরিবারিক নিমন্ত্রণে—শতকরা ৬ ভাগ

বিজ্ঞাপন ও প্রজাপতি অফিস মারফৎ—শতকরা ১ ভাগ

গবেষক মঁ জিরার বলেছেন যে, ফরাসী যুবক-যুবতীরা এমন জায়গায় পরিচিত হয় যেখানে সামাজিক স্তরের বাধা-নিষেধ কম। কে কোন সমাজের কোন স্তরে বাস করে এই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এরা একজন অপরের আকর্ষণে মিলিত হয়। ফলে তথাকথিত সমাজিক সমস্যাটা কমে আসে। আরেক পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন যে, সাধারণতঃ ফরাসী ছেলেরা বিয়ে করে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে আর মেয়েরা বিয়ে করে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। বিয়ের আগে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে প্রায় দু' বছর বাগদত্তা থাকে।

* * * *

ফরাসী সংখ্যা বিজ্ঞান পরিষদের আর এক গবেষণায় প্রকাশ, ফরাসী ছেলে-মেয়েরা আজকাল কম বয়সে বিয়ে করছে। ১৯৬২ সালের আদমসুমারি বিশ্লেষণ করে সংখ্যা বিজ্ঞান পরিষদ বলেছে যে, আগেব মতন এখন আর ফরাসীরা বেশী বয়সে বিয়ে করে না। তিন জনের মধ্যে একজন ছেলে বিয়ে করে ২৪ বছরের আগে আর দুইজন মেয়ের মধ্যে একজন বিয়ে করে ২২ বছরের আগে।

সংখ্যাবিজ্ঞান পরিষদের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, গড়ে ফরাসী পরিবারে তিনটি করে সন্তান। ছত্রিশ বছর ধরে বিবাহিত জীবনে তিনটির বেশী সন্তান দেখা যায় না। দশটি দম্পতির মধ্যে চারটির বিবাহের প্রথম বছরে একটি সন্তান জন্মায়। অনেক পরিবারে ষোল বছর বিবাহিত জীবনের পর একটি সন্তান জন্মায়। তাদের সংখ্যা কম। ফ্রান্সে বছরে ডিভোর্স হয় মাত্র আটাশ হাজার।

মাদমোয়াজেল বনাম মাদাম

সেইন জেলার (যার রাজধানী প্যারিস) শাসনকর্তা এক আদেশে বলেছেন যে, এখন থেকে সেইন জেলার কুমারী মাতাদের 'কুমারী' বলা চলবে না। মাদমোয়াজেল'এর পরিবর্তে তাদের 'মাদাম' বলে সম্বোধন কবতে হবে। সরকাবী কর্তৃপক্ষ কুমারী মাতাদের শ্রীমতী বা মাদাম বলে সম্মানিত করতে চাইলেও তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন কিনা সে খবর কর্তৃপক্ষ নেননি। কারণ অধিকাংশ মাদামই চান তাদের যেন মাদ্‌মোয়াজেল বলে সম্বোধন করতে। কারণ বর্ষীয়সী মহিলাদের কুমারী বলে সম্বোধন কবলে তাঁরা যতখানি সন্তুষ্ট হন ততখানি যেন হননা মাদাম বলে সম্বোধন করলে। এ ব্যাপার দেখা যাবে ইউরোপের সর্বত্র। এ ব্যাপার ইউরোপে কেন, আমাদের দেশে কোনো পঁয়ত্রিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছরেব মহিলাকে মিস বা কুমাবী বলে সম্বোধন করলে তিনি যতখানি খুসী হবেন ততখানি নিশ্চয়ই হবেন না মাদাম বা শ্রীমতী বললে। কারণ তাঁরা চিরকালই কুমারী থাকতে চান। এ সম্বন্ধে কেউই দ্বিমত হবেন না। বিবাহিত হলেও।

সরকারী হিসাবে প্যারিসে কুমারী মাতাদের সংখ্যা ২৫,০০০ এবং বৃহত্তর প্যারিসে ১৫,০০০ মাত্র। ১৯৫৯ প্যারিসে কুমারী মাতা ও বে-আইনী সন্তানদের সংখ্যা ছিল ৬৫০৩ আর বৃহত্তর প্যারিসে ৪১৪৫। ১৯৫৮ সালে দুই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৭২১ ও ৪০৬৫।

কুমারী মাতাদের সংখ্যা চিরস্থায়ী নয়, তাদের অধিকাংশেরই পরে বিবাহ হয়ে থাকে। ১৯৫৯ সালে এমনি ধরণের ১১১০৬টি

সন্তানকে তাদের পিতা-মাতা আইনসঙ্গতভাবে গ্রহণ করে। ১৯৫৮ সালে সে সংখ্যা ছিল ১১১৫৭।

এতকাল ফ্রান্সে পুরুষের সংখ্যার তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা ছিল বাড়তি। এবার তথ্য থেকে জানা গেল যে, সে সংখ্যায় এখন ব্যতিক্রম ঘটেছে। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম। বিবাহযোগ্য ৪০০,০০০ মেয়ের অভাব। অপর দিকে বৃটেনে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অধিক। বৃটেনে বিশ লক্ষ স্ত্রী সংখ্যা উদ্বৃত্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ফরাসী লোক সংখ্যায় পরিবর্ত্তন এসেছে। লোক সংখ্যা বাড়তির হার যুদ্ধ পূর্বের তুলনায় বাড়ছে। বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা কমছে। পরিবারের আয়তন বাড়ছে অর্থাৎ সন্তান সংখ্যা বাড়ছে। যা যুদ্ধের আগে ছিল না।

ফ্রান্সের সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তরের মতে ফ্রান্সে অবিবাহিতের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ১৮৮৬ সালে প্রতি নয়জনের মধ্যে একজন ছিল অবিবাহিত। ১৯৬০ সালে পনরজনের মধ্যে মাত্র একজন অবিবাহিত। অর্থাৎ বিবাহিতের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৬০ সালে ৩২০,০০০টি বিবাহ হয়েছে, তারই ঠিক একশত বছর আগে বিবাহ সংখ্যা ছিল ২৮০,০০০। তবে মনে রাখতে হবে যে, একশ বছর আগে লোকসংখ্যাও ছিল কম। সুতরাং সেই অনুপাতে এখন বিবাহের সংখ্যা বেড়েছে তিনজন। বিংশশতাব্দীতে সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় বিবাহ হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ১৯১৫ সালে ৬২২,৭০০টি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৪৬ সালে হয় ৫১৬,৯০০টি বিবাহ। বিবাহের সংখ্যা বাড়ছে বটে কিন্তু সন্তানের সংখ্যা কমছে সেই অনুপাতে। ১৮১৬ সালে ফরাসী মেয়েদের গড়ে সন্তানসংখ্যা ছিল ২-০৭, ১৯৬০ সালে সেই সংখ্যা ১-৩৪।

চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১৮৯৬ সালে ১১,২৫৪, আর ১৯৫৯ সালে ৪৪,৯৫৪। দাঁতের চিকিৎসকদের সংখ্যা ছিল ১৬৭৯ সেই সংখ্যা এখন ১৪৬৩০।

ষষ্ঠীপূজা ও সন্তান পালন

২৮শে মে তারিখে এখানে মাতৃ-দিবস পালিত হয় সরকারী-ভাবে। ২৮শে মের সকালে ফরাসী রাষ্ট্রপতি ভবনে পুরস্কার দেওয়া হয় অধিক সংখ্যক সন্তানের জননীদের। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় সাধারণতঃ দশটিরও বেশী সন্তানের মাতাকে। এটা শুধু পুরস্কার দানের উৎসব নয়। এইদিন মায়েদের উৎসব বলে সন্তানেরা রান্না করে বা অন্য কোথাও নেমন্তন্ন করে মায়েদের খাওয়ায়, তারপর তাঁকে দেয় তারা নানান জিনিসের উপহার। পত্রিকায় পত্রিকায় দেখা যাবে দোকানদারদের বিজ্ঞাপন, এটা সেটা উপহার দিন, ইত্যাদি। মাতৃদিবস এদের কাছে উৎসব। আমাদের দেশে ষষ্ঠী পুজোর অর্থও একই। কিন্তু আমরা ষষ্ঠী পুজো করে পরে খালাস। যারা জন্মাল তাদের ভবিষ্যৎ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা নির্বিকার। সবই খোদার ওপর ছেড়ে দিয়ে খালাস। কিন্তু এরা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তিত। তাই মাতৃদিবসে সুরু হয় সন্তান সপ্তাহ। এই সন্তান সপ্তাহ চলে পুরো সপ্তাহটা ধরে। সন্তান বা শিশু সপ্তাহে চলে বিভিন্ন শিশুকল্যাণ অনুষ্ঠান, সভা ও সরকারী প্রচেষ্টায় শিশুকল্যাণের উন্নতিমূলক কর্মসূচী রচনা। এখানে সন্তান পালনের দায়িত্ব শুধু পিতা-মাতার নয়, সমাজ ও সরকারের। সরকারের বিভিন্ন আইন-কানুনের মাধ্যমে পালিত হয়ে থাকে শিশুসন্তান।

কিছু কাল আগে ফ্রান্সের অঁজের শহরে ইস্কুলে পাঠরত বালক-বালিকার পিতা-মাতাদের সমিতির বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জানা যায় যে উক্ত সমিতি অনুসন্ধান করে জেনেছে ইস্কুলে তাদের সন্তানরা কেমন পরিশ্রম করে, কি রকম পড়াশোনা করে ইত্যাদি। এই সমিতি প্রায় দশ হাজার পরিবারে ছাপান

৪১টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে সমিতি এই খবরগুলো প্রকাশ করেছে।

অধিকাংশ ফরাসী মা-বাপই তাঁদের সন্তানদের প্রতি বেশ কড়া। শতকরা ৬০ জন পিতা-মাতা মনে করেন যে, ষোল বছরের পর ছেলে-মেয়েরা তাদের ইচ্ছে মতন বেশী রাত্রে শুতে পারে, তার আগে তারা বাপ-মায়ের কথা মতন রাত আটটা বা নটার মধ্যেই ঘুমুতে বাধ্য।

মধ্যবিত্ত পরিবারের শতকরা ৪৯ জন তাদের সন্তানদের নিজের ঘরে বন্ধু বান্ধব আনবার অনুমতি দিয়ে থাকেন। ওই ব্যাপারে শ্রমিক ও চাষী পরিবারের মাত্র ১৭ জন অনুমতি দেয় এবং এই শ্রেণীর পরিবারে শতকরা ১০ জন ছেলে-মেয়ে তাদের বাপ-মায়ের সাথে একই ঘরে শোয়; যা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘটে না।

সন্তানরা কোন্ ধরণের সংবাদপত্র বা বই পড়ে সে সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখে শতকরা ৮০ জন; শতকরা ৬০ জন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সব ধরণের রেডিও প্রোগ্রামে বাধানিষেধ করে থাকেন।

শতকরা ৩৫ জন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলের সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে নজর দিয়ে থাকেন। শতকরা ৮০ জন পিতা মাতা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন পড়াশোনার খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। বছরে কয়েকবার ইস্কুলের মাষ্টারমশাইদের সাথে দেখাশোনা করেন পিতা-মাতার দল, তার মধ্যে ছেলেদের জন্য শতকরা ৭১ আর মেয়েদের জন্য শতকরা ৬৬।

রবিবারে বা ছুটির দিনে শতকরা ৭০টি ছেলে ও ৭৭টি মেয়ে তাদের পিতা-মাতার কাছেই থাকে। যাদের বয়স চৌদ্দ বছরের ওপরে তাদের মধ্যে শতকরা ৫৪ জনকে তাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে বাইরে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। এই সব চৌদ্দ বছরের ওপরে ছেলে-মেয়েদের শতকরা ১৭ জনকে তাদের

পিতা-মাতা সন্তানদের কোন একদিন পকেট খরচা দিয়ে থাকে। তবে ইস্কুলে পড়াশোনা ভাল করলে তার দরুণ শতকরা ৬৩ জন ছেলে-মেয়েকে পুরস্কারস্বরূপ পয়সাকড়ি দেওয়া হয়ে থাকে। এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪৪ জন সপ্তাহে কিছু না কিছু পয়সা পেয়ে থাকে সংসারে নানান কাজ করার পুরস্কার-স্বরূপ। অনেক ছেলে-মেয়েই সংসারে কাজ করে দু পয়সা "রোজগার" করে থাকে।

গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে প্রায় অর্ধেক ছেলে-মেয়ে ছুটি উপভোগ করে সরকার পরিচালিত ছুটি কাটাবার ক্যাম্পে। অর্ধেক ছুটি কাটায় তাদের বাপ-মায়ের সাথে। কারণ অধিকাংশ পিতা ও মাতার দল দুইজনেই চাকরি-বাকরি করে।

* * * *

এক খবরে জানা গেল পূর্ব ফ্রান্সের নার্সি শহরে মাতৃদুগ্ধের ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। ব্লাড ব্যাঙ্কের মতন মাতৃদুগ্ধেব প্রয়োজন হলে শিশুদের দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে সব শিশুর মাতারা রুগ্না বা মৃত, তাদের জন্যে এই মাতৃদুগ্ধের ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে।

সামাজিক ক্যান্সার

মদ্যপান ভাল কি মন্দ এই নিয়ে দুই দল ফরাসী ডাক্তারের মধ্যে চলছে ভীষণ ঝগড়া। মদ্যপান বিরোধী প্রচারকার্য ফ্রান্সে সুরু হয়েছে ১৯৫৫সালে। মদ্যপান বিবোধী প্রচার দপ্তরকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে ফরাসী সরকাব। রাস্তায়-ঘাটে দেখা যাবে মদ্যপান বিরোধী প্রচারপত্র। ফরাসী একাডেমি অব মেডিসিনের অধিকাংশ খ্যাতনামা চিকিৎসক মদ্যপানের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। মাসখানেক আগে এই নিয়ে অঘটন ঘটল। ফরাসী চিকিৎসক সমিতির কয়েকজন ডাক্তার এক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, বেশী মদ্যপান করলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে বাধ্য কিন্তু মদের খাদ্যগুণ আছে। মদের যে খাদ্যগুণ সে সম্পর্কে তাঁরা এক ফিরিস্তি বাজারে ছাড়েন। ব্যস, এরপর লাগল দুই দল বিশেষজ্ঞের ঝগড়া। ফরাসী মেডিক্যাল একাডেমির মুখপাত্র সংবাদপত্র মারফৎ ঘোষণা করেছে যে, মদের খাদ্যগুণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সব ভুল। এই নিয়ে মদ্যপান বিরোধীরা অনেক সভা-সমিতি ডেকেছে।

প্যারিসের মদ্যপান নিরোধক গবেষণা পরিষদের এক বিবৃতিতে জানা গেছে যে, যে সব পরিবারে গৃহস্বামী মাতাল তাদের সংসারে কর্তাগিরি করে স্ত্রীরা এবং শতকরা ৪০ ভাগ তারাই সংসারে হুকুম করে। কিন্তু যে সব পরিবারে মাতাল নেই সেখানে পুরুষরাই সংসারে হুকুম করে, তাদের স্ত্রীরা নয়। সাধারণতঃ দেখা গেছে, যে সব স্বামীর বয়স স্ত্রীর চেয়ে কম তারাই বেশী মাতাল হয়। তারপর আরও জানা গেছে, যত শিশু অপরাধীর বিচার হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৫৬টি অপরাধী এসেছে মাতাল পরিবার থেকে। এই সব শিশু অপরাধী তাদের বাবা-মায়ের মদ্যপানের সুযোগ নিয়ে দশ বছর বয়স থেকে তারাও মদ্যপান সুরু করেছে।

এবং তার পরিণতি শিশু অপরাধীর কারাগারে। কল-কারখানায় যত দুর্ঘটনা ঘটে তার মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ হল শ্রমিকদের অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে।

অবিবাহিতরা বিবাহিতদের চেয়ে কম মদ্যপান করে। সহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে মাতালের সংখ্যা বেশী। তবে সেখানে ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে যকৃৎ রোগে মৃত্যু হয় ফ্রান্সে ৩২-৫; ইতালিতে ১৫-২, সুইজারল্যাণ্ডে ১৩-৭ এবং জার্মাণীতে ১৩-৬। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে এক ফ্রান্সেই যকৃতের রোগে বছরে মারা যায় বিশ হাজার লোক।

রুশদের বিয়ের ঝামেলা

ইংরেজ ফরাসীদের ঘরের কথা, সমাজের কথা আপনারা অনেক শুনেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষ করে রুশদের ঘর-সংসারের কথা আমাদের বিশেষ জানা নেই। এদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। এক সাংবাদিক মস্কো থেকে এক মজাদার খবর লিখে পাঠিয়েছেন। তবে সংবাদদাতা যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা হল বিরাট সহর মস্কোর সামাজিক বার্তা। রুশদের বিবাহ কাহিনী।

জনবহুল বিরাট সহর মস্কো। সবাই কাজে-কর্মে ব্যস্ত। তাই সবাই চান সংক্ষেপে কাজ সারতে। স্পুটনিকের যুগে কার আর অফুরন্ত সময় আছে। রোমান্সের যুগ শেষ হতে চলল বলে। বিবাহ করার রোমান্সও আজ প্রায় যেতে চলেছে। তার প্রমাণ দেবে ইদানিংকালে মস্কো নগরী। ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের মতন বিরাট অট্টালিকা, সবই আছে এই বাড়ীতে। কিন্তু এই ভবনটি সবার জন্যে উন্মুক্ত নয়। একে বরং ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর্স না বলে বিবাহ ষ্টোর্স বলা উচিত। কারণ এখানে শুধু বিবাহকারীদের প্রবেশাধিকার আছে আর আছে নববিবাহিতের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের। এই বিবাহ ভবনের একাংশ হল 'সিভিল ম্যারেজ' অফিস, গহনা-পত্রের দোকান, পোষাকের দোকান, ফুলের দোকান, রেস্তোরাঁ, আর বিবাহ পর্বের পর মধু-চন্দ্রিকাযাপন উদ্দেশ্যে কোথাও বেড়াতে যেতে হলে ট্রেণের, বিমানের বা জাহাজের টিকিটও এখানে কেনা যায়। এমন কি অনেক নববিবাহিত দম্পতি মধুচন্দ্রিকাযাপনের বদলে হেলিকপ্টারে চড়ে মস্কো সহর দেখে বেড়ান। সেই হেলিকপ্টার ভাড়া করাও যায় এই বিবাহ ভবনে। বিবাহের আগে ও পরে যা কিছুর প্রয়োজন সবই মিলবে এই ভবনে। সরকারী মতে বিবাহ হওয়ার আগে

কনে ও বর বিয়ের আংটি, গহনা বা পোষাক এখানেই খরিদ করতে পারে। তারপর বিবাহপর্ব সাঙ্গ হলে তাদের অর্ডার মাফিক ওখানেই রেস্তোরাঁয় তাদের নিমন্ত্রিত অতিথিদের সেবাপর্বও সাঙ্গ হয়। ওখানে দশ থেকে একশতজনকে পরিবেশন করার ব্যবস্থাদি আছে। তারপর এই কন-কনে শীতেই দামী ফুল পাওয়া যাবে বিবাহ ভবনে যা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য দুষ্প্রাপ্য ফুলের জন্য দক্ষিণা দিতে হয় দস্তুর মতন। আমাদের দেশে বিবাহের চেয়ে বিবাহপর্ব ও সামাজিক রীতি পালন সে এক এলাহি ব্যাপার। ওই এলাহি কাণ্ড পালন করতে অনেকেই ফতুর হয়ে যান। কিন্তু মস্কোর এই নতুন ব্যবস্থায় অত তুমুল কাণ্ডের ও পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। সময়ের সাথে অর্থও বাঁচে। সাংবাদিকটি তাঁর বিবরণে বলেছেন যে, উদাহরণ স্বরূপ এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। বর ও কনে এসেছে বিবাহ ভবনে বিয়ে করতে। কনে মারিনার বয়স একুশ, বর ইউরির বয়স বাইশ। তারা দুজনেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। কনে মারিনা মাসিক বৃত্তি পায় একশ পঁচাত্তর টাকা আর বর ইউরি মাসে বৃত্তি পায় দুইশ পঞ্চাশ টাকা। তারা তাদের বৃত্তির টাকার ওপর নির্ভর করেই বিবাহ পর্বে নেমেছে। তাদের জমান টাকায় ওই বিবাহ ভবনে তারা কিনেছে ১৭০ টাকায় দুটো আংটি, বর ইউরির জন্যে একটি স্যুট ৫০০ টাকায়, মারিনার পোষাক ২৫০ টাকায়। তার ওপর তারা নিমন্ত্রণ করেছে পঞ্চাশজন অতিথিকে।

মস্কোর এই বিবাহ ভবনটি সোভিয়েট ইউনিয়নে অদ্বিতীয়। মনে ভাববেন না, যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্রই বুঝি এইভাবে বিবাহপর্ব সাঙ্গ হয়ে থাকে। তবে মস্কোতে যে বিবাহ ভবনের সুরু সেখানেই তার ইতি নয়। তার বিস্তার চলবে সমগ্র দেশ জুড়ে ভবিষ্যতে।

দাম্পত্য জীবনে প্রেম

পশ্চিম ফ্রান্সের আটলান্টিকের উপকূলে রইয়াঁ শহরে এক বিচিত্র মহা-সম্মেলন হয়ে গেল। নাম তার মহিলা সম্মেলন। পাঁচশত মহিলা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মহিলা সম্মেলনের আয়োজন করে ফ্রান্সের প্রোটেষ্টাণ্ট মহিলা সমিতি। মহিলা সম্মেলনে মাত্র দুজন পুরুষ বক্তা ছিলেন অধ্যাপক মেল ও অধ্যাপক কনিল। এঁরা দুজনে ত্রাসবুর্গ ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। যে সব মহিলা এই সম্মেলনে যোগদান করেন তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ছয় জন ছিলেন অবিবাহিত, বাকি সবাই বিবাহিত। তারা যখন সম্মেলনের কাজে ব্যস্ত তখন তাদের স্বামীরা ঘরে বসে রান্না থেকে আরম্ভ করে ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করেছে।

এই মহিলা সম্মেলনের অনেক আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল 'দাম্পত্য জীবনে প্রেম'। একালের প্রেম-প্রণয় সমস্যা নিয়ে একদিন ধরে আলোচনা চলে। মহিলা সম্মেলনে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করে বলে, এক জার্মাণ মহিলা (ইনি অবিবাহিত) বলেছেন যে, প্রেমের ব্যাপারে ফরাসীরাই নাকি শ্রেষ্ঠ। এটি তাঁর অভিমত। আরেক নাম করা ফরাসী মহিলা সাহিত্যিক, মাদাম কলেৎ অড্রে বলেছেন যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ১৯৬৩ সালেও মেয়েরা বেশ স্বার্থপর। তারা তাদের দায়িত্ব সব বোঝার ভার চাপায় তাদের স্বামীর ঘাড়ের ওপর। এবং চাপিয়ে তারা খালাস। উচিত হবে মেয়েদেরও সেই বোঝার ভার বহন করা। তাহলেই আসবে সত্যিকারের স্ত্রী-স্বাধীনতা।

এই সম্মেলন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করে যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও প্রেমের জয় আমরা সবই মানলাম কিন্তু তাঁরা যখন তিনদিন ধরে সম্মেলন চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের স্বামীদের কথা কি তাঁরা ভেবেছিলেন? তাঁদের স্বামীরা হাত পা পুড়িয়ে আধা সেদ্ধ জিনিস গিলেছে আর নয় সারাদিন ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করতে বাধ্য হয়েছে। স্ত্রী স্বাধীনতার নামে একি স্বামী ব্যাচারিদের ওপর অত্যাচার নয়?

প্রবাদ বাক্যের সামাজিক মূল্য

প্রবাদবাক্য সবসময়েই সুমিষ্ট হয় না, কখনো কষায়, কখনো বা তিক্ত। কিন্তু তাহলেও প্রবাদবাক্যের দার্শনিক মূল্য অনেকখানি। যে দেশ যত বেশী প্রাচীন, সে দেশে তত বেশী প্রবাদবাক্য প্রচলিত। দেশবিদেশের প্রবাদবাক্য সংগ্রহের একটি নতুন বই প্রকাশ করেছেন মঁ মরিস মালু নামে এক ভদ্রলোক। তাঁর বইখানা অনেকটা অভিধানের মতন। শুধু ইউরোপের প্রবাদবাক্য দিয়ে তিনি তাঁর বইখানি ভরেননি। তাঁর বইয়ে আছে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রবাদবাক্য সংগ্রহ। ঈজিপ্তের এক প্রবাদবাক্যের নমুনাস্বরূপ বলা হয়েছে যে, বিশাল পিরামিডের ছায়ায় একদল উটের সর্দারকে উটের মতনই দেখায়। একটি গ্রীক প্রবাদ হচ্ছে; পায়ের চেয়ে হাঁটু অনেক কাছে। ডেনমার্কের এক প্রবাদ, ইচ্ছে করলে আরেকজনের মোমবাতি থেকে নিজের মোমবাতি জ্বালান যায়। তবে বিবাহ সম্বন্ধে সব দেশের প্রবাদবাক্যই প্রায় সমান। বিবাহ সম্বন্ধে গ্রীক প্রবাদ হল এই, বিবাহ হইল একটিমাত্র বেদনাদায়ক জিনিস যে, তার অনুসন্ধান করতে হয়। আরব প্রবাদে বলে, বিবাহ হচ্ছে একটি কাল্পনিক ঘর, যারা সেখানে যায়নি, তারা যেতে চায় আর যারা সেখানে গেছে, তারা বেরিয়ে আসতে চায়। স্প্যানিশ প্রবাদে বলে, বিবাহ হচ্ছে তরমুজ, তরমুজের মতন দৈবাৎ ভাল হয়। পোলিশ প্রবাদে বলে, বিবাহের আগে কাঁদে মেয়েরা আর বিবাহের পরে পুরুষেরা। ইংরেজী প্রবাদে, বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি জীবে পরিণত হয়, কিন্তু কোনটি? পুরুষাকারে না মেয়ের আকারে? ফরাসীরা বলে, প্রণয়ের আগুন জ্বলে রান্নাঘরে। ভারতের প্রবাদ সবারই জানা, সে হল দিল্লীকা লাড্ডু। নয়কি?

আত্মহত্যা লোকে কেন করে ?

আত্মহত্যা লোক কেন করে এই সম্পর্কে এক সভা হয়ে গেল কিছুকাল আগে ভিয়েনায়। ভিয়েনা শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন যে, আত্ম-হত্যা একটি রোগ বিশেষ। যে কোনো কঠিন ব্যাধি যেমন একদিনেই হয় না, তার উপসর্গ আগে দেখা দেয়, তারপর হয় তার ক্রমবৃদ্ধি, তেমনি আত্মহত্যার আগে আত্মহত্যাকারীর মধ্যেও দেখা দেয় নানা ধরনের উপসর্গ। তবে সে সবই হল মানসিক। ওটা দেহের রোগ নয়, মনের। কোনো ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিলে সময় থাকতে যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে যেমন কঠিন ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায় তেমনি আত্মহত্যাকারীর মধ্যে যখন উপসর্গ দেখা যায় তখন সময় থাকতে তার চিকিৎসা করতে পারলে তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

যে সব বিশেষজ্ঞ ভিয়েনার আন্তর্জাতিক সভায় মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন মনোবিজ্ঞানী। সেই মনোবিজ্ঞানীদের চিকিৎসায় থাকলে আত্মহত্যা নামক রোগ সারান চলে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, আত্মহত্যাকারীর অনেক উপসর্গের মধ্যে হল ব্যর্থ মনোভাব। তাঁরা আরও বলেছেন যে, আত্মহত্যাও অন্যান্য সংক্রামক রোগের মতন ছড়ায়। যাতে তা না ছড়ায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসকদের উচিত হবে রেফিউজি ক্যাম্পে, সৈন্যাবাসে বা যেখানে এক সাথে অনেক লোক থাকে, বৃদ্ধদের বিশেষ ক্যাম্পে, কুমারী মাতাদের মধ্যে আত্মহত্যাকারী রোগীদের খুঁজে বেছে বার করতে। সময় থাকতে এদের মনোবিজ্ঞানের মতে চিকিৎসা করালে সবই সারতে বাধ্য। এই কারণে ইউরোপের অনেক দেশেই এস ও এস প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তাদের সেখানে খোঁজ করলে সব রকমের সাহায্য পাওয়া যায়। ইউরোপে এখন সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যা হয়ে থাকে অষ্ট্রিয়ায়, সুইডেনে ও সুইজারল্যাণ্ডে।

শরীরের ওপর শব্দের প্রভাব

সারাদিন পরিশ্রম করে এসে যখন বিছানায় একটু বিশ্রাম করতে গিয়েছেন অমনি কানে এসে লাগল কলকাতার কোনো এক বারোয়ারি পুজো মণ্ডপের নয় তো কোনো জলসার আওয়াজ লাউড স্পীকার যোগে। যেন অসংখ্য হাতুড়ি আপনার কানে দমাদম পিটছে। আপনি অসহায়ের মতন বিছানায় কাৎরাতে লাগলেন। অপর দিকে জলসায় কর্মকর্তা ও গায়করা উল্লাসে লাউড স্পীকারের মাত্রা চড়িয়ে দিলেন। শুধু লাউড স্পীকারের আওয়াজ নয়, যানবাহনের আওয়াজ থেকে কল-কারখানার আওয়াজ মনুষ্য শরীর যন্ত্রকে যে কতখানি কাহিল করতে পারে তার বিবরণ দিয়েছে পশ্চিম জার্মাণীর ডর্টমুণ্ড সহরের শরীরতত্ত্বের ওপর ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক ইনষ্টিট্যুট। এই ইনষ্টিট্যুটে এখন চলছে বিস্তৃত গবেষণা। ওই গবেষণা মন্দিরের গবেষকরা বলেছেন যে, ছোট আওয়াজ বা বিকট আওয়াজ যে শুধু মানসিক অবসাদ আনে তা নয়, আনে শরীরেও। তাঁরা বলেছেন যে, শান্ত পরিস্থিতিতে একজনের রক্তের চাপ ও শরীর যন্ত্রের কাজ যেভাবে হয়ে থাকে, ঠিক তাকেই কোনো কোলাহল ও বিকট আওয়াজের সামনে আনলে দেখা যাবে তার রক্তের চাপ ও শরীরের বিভিন্ন অংশ উত্তেজিত। এবং তার ফলে দেহটি হয়ে পড়ে অনায়াসে ক্লান্ত।

বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেছেন যে, যে সব কারখানায় বিকট আওয়াজের মধ্যে কাজ করে এমন সব শ্রমিক যখন তাদের গৃহে ফেরে তাদের ব্যবহার ও শান্ত পরিবেশে যারা কাজ করে তাদের ব্যবহার ভিন্ন রকমের; আওয়াজ থেকে উদ্ভূত শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে যে কতখানি সাংসারিক অশান্তি আনে

তার ইতিবৃত্তও দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁদের মতে টুং-টাং শব্দ থেকে বিকট আওয়াজ যত সম্ভব কমিয়ে ফেলা ভাল। নইলে ভবিষ্যতে অনেকেই শব্দ রোগে ভুগবেন। আর কয়েকজন মানুষ মাত্র তিন মিনিট ওই নিঃশব্দ ঘরে থাকতে পেরেছিল। তারা তিন মিনিট বাদে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শব্দের আধিক্য হলে যেমন মানুষ সহ্য করতে পারে না তেমনি একেবারেই শব্দ না হলেও সে বাঁচতে পারে না। শব্দহীন ও শব্দবহুল স্থান কোনোটিই মানুষের দেহযন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

মাথাপিছু চিকিৎসকের সংখ্যা

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানিজেশন-এর এক বিবৃতিতে জানা গেল, বিশ্বে পনর লক্ষ ডাক্তারের অভাব। জনসংখ্যার অনুপাতে একজন ডাক্তার, তারই হিসেব দেওয়া গেল। মাথাপিছু ডাক্তারের সংখ্যা যথাক্রমে ইস্রায়েল ৪২০; সোভিয়েট রাশিয়া ৫৫০; চেকোশ্লোভাকিয়া ৫৯০; অষ্ট্রিয়া ৬২০; হাঙ্গেরী ৬৫০; ইতালী ৬৯০; পশ্চিম জার্মাণী ৭৩০; সুইজারল্যাণ্ড ৭৩০; বুলগেরিয়া ৭৪০; আর্জেন্টিনা ৭৬০; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ৭৯০; বেলজিয়াম ৮০০; রুমানিয়া ৮০০; ডেনমার্ক ৮২০; গ্রীস ৮৩০; অষ্ট্রেলিয়া ৮৫০; উরুগুয়ে ৮৬০; স্কটল্যাণ্ড ৮৫০; হল্যাণ্ড ৮৯০; নরওয়ে ৯০০; কানাডা ৯৩০; ফ্রান্স ৯৩০; জাপান ৯৪০; লুক্সেমবুর্গ ৯৯০। আর ভারতবর্ষে কত জানেন? আড়াই হাজারে একজন ডাক্তার।

দুগ্ধ চিকিৎসা

এক ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ্ মঁঃ ইগর দ্য গারিন প্যারিসের নৃতত্ত্ব-পরিষদের তরফ থেকে পশ্চিম আফ্রিকায় অনেককাল গবেষণাদি করে দেশে ফিরে যে সব বিবৃতি দিয়েছেন তার জন্যে তিনি ফরাসী সরকারের পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর বিবৃতির মধ্যে এটি ছিল উল্লেখযোগ্য: পশ্চিম আফ্রিকার মাশা উপজাতিদের পুরুষেরা শক্ত-সমর্থ ও সুন্দর হবার জন্যে প্রতি বছরে দুগ্ধ চিকিৎসা করে। এই দুগ্ধ চিকিৎসার নাম 'গুরু'। দুধ চিকিৎসায় পরিমাপ মতন দুধ খেতে হয়। কিন্তু এই চিকিৎসা মেয়েদের জন্য নয়। তাদের কাছে ও হচ্ছে বেআইনী। আমাদের দেশে যারা রূপপরিচর্যা করেন নিয়মিত তাদের কাছে এধরণের আইন নিশ্চয়ই মনঃপূত হবে না।

ইউরোপে নারী প্রগতির নমুনা

ভারতে মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় যেমন ভারতীয় নারী সমাজের বিজয় সংবাদ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি ইউরোপের কয়েকটি দেশে মহিলাদের প্রতি সরকারী আইন-কানুনও পাল্টাচ্ছে।

ফরাসী বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী।" এই রাজনৈতিক বুলি ফ্রান্সে সর্বত্র প্রযোজিত হয়েছে কিন্তু মহিলাদের বেলায় নয়। ফ্রান্সে আগে মহিলাদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। দ্য গল ফরাসী সরকারের ক্ষমতা পেয়ে ১৯৪৬ সালে নতুন আইন প্রয়োগ করে মেয়েদের ভোট দেবার ব্যবস্থা করেন। দ্য গল সরকার সাবেক নতুন আইন পাশ করেছেন। ১৯৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হতে সে আইনবলে বিবাহিত মহিলারা স্বামীর মতই সমান বৈষয়িক অধিকার লাভ করবেন। স্বামীর মতই বিবাহিতা মহিলার রোজগারের টাকায় সম্পত্তি কেনা হলে সে সম্পত্তি বিক্রীর সময়ে স্ত্রীরও সম্পূর্ণ অধিকার ও তার বখরা থাকবে।

সবচেয়ে বেশী বিস্ময় এনেছে পূর্ব জার্মাণ সরকারের নতুন আইন। পূর্ব জার্মাণ সরকারের পারিবারিক আইন কার্যকরী হয় ১লা এপ্রিল ১৯৬১ হতে। ১লা এপ্রিল নিয়ে ইউরোপে তামাসা চলে। পূর্ব জার্মাণ সরকারের নতুন আইন কি তাদের দেশের পুরুষদের "এপ্রিল ফুল" করার জন্যে ?

পূর্ব জার্মাণ সরকারের নতুন আইন ফরাসীদের চেয়ে এক কাঠি ওপরে যায়। এদের নতুন আইনে বলা হয়েছে যে, সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে কমরেড বা সহকর্মীর মত। এদের দু'জনের আয়ের টাকা সমান ভাবে বাট করা হবে। স্বামী-স্ত্রীর কেনা

সম্পত্তি, আসবাবপত্র বিক্রী করার সময়ে বা বিবাহ বিচ্ছেদের সময়ে সমানভাবে ভাগ করা হবে।

বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী ইচ্ছে করলে তাঁদের পদবী বদলাতে পারেন বা স্ত্রী তাঁর নিজের পদবী বজায় রাখতে পারেন। পদবী বদলাবার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তাঁরা ইচ্ছে করলে তাঁদের সন্তানদের পদবী দিতে পারবেন স্বামীর পদবীতে অথবা স্ত্রীর পদবীতে।

ইউরোপে প্রায় সব দেশেই আজকাল লাখ লাখ মেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করছে।

বৃটিশ মহিলা চাকুরেদেব সম্বন্ধে বিখ্যাত চিকিৎসা পত্রিকা "ল্যানসেট"-এর এক দল চিকিৎসক অনুসন্ধান চালিয়ে বলেছে যে, তাঁদের কাছে যত মহিলা চাকুরে আসে চিকিৎসা কবতে তাদের একমাত্র রোগ হল মাথাধরা, বদ-হজম ও স্নায়বিক বোগ। ডাক্তাররা বলেছে যে, অধিকাংশ মহিলা চাকুরে অত খাটুনি সহ্য করতে পারে না বলেই স্নায়বিক রোগে ভোগে। সকাল সাতটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাত সাতটায় বাড়ী ফিরে এদের অধিকাংশ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয় ভীষণভাবে। তখনই তাদের স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রকাশ পায়। ফলে তারা অল্পতেই রেগে যায়, রাগের মাথায় ছেলে-মেয়েদের গালে চড় মারে। এমন কি স্বামীদের প্রতিও। ফলে নানান রকমের পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়। অফিস থেকে বাড়ী ফিরে তাদের আবার সংসারের কাজ করতে হয়। ছুটির দিনে রবিবারেও রান্না বরা ছাড়াও ধোয়া-মোছার কাজ করতে হয়। মনে রাখতে হবে একমাত্র লক্ষপতি ছাড়া খুব অল্প লোকেই ঝি-চাকর রাখতে পারে। তাই সংসারের সব চাপ পড়ে মেয়েদের ওপর। একালের ইউরোপীয় মহিলাদের নানান রোগের এটাই মুখ্য কারণ।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মহিলা জগতের খবর অতি সংক্ষেপে দিচ্ছি। সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ার জনসংখ্যা হল বাইশ কোটি

নব্বুই লাখ। তারমধ্যে বার কোটি ত্রিশ লক্ষ হল মহিলা। এর মধ্যে চার কোটি ছিয়াত্তর লাখ মহিলা কাজ করেন বিভিন্ন শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য দপ্তরে।

ছোটখাট কাজ ছাড়া এঁদের মধ্যে ১৮০,০০০ জন মহিলা করছেন রাশিয়ার বিভিন্ন গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকের কাজ। তাঁদের মধ্যে ৪০,০০০ জন মহিলা সত্যিকারের গবেষণায় নিযুক্ত, রাশিয়ার বিভিন্ন পরিষদের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সংখ্যা ৯০০ জন।

সোভিয়েট রাশিয়ার চিন্তাশীল মহলে এঁরা পিছিয়ে নেই। সবশুদ্ধ রয়েছে ৬৪৩ জন মহিলা লেখিকা, ৩৪২৬ জন সাংবাদিক ও ১৯৬১ জন চিত্রকর।

রাজনীতিতে এঁদের সংখ্যা হল নিম্নরূপ : সোভিয়েট লোকসভায় মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৩৯০, বিভিন্ন প্রাদেশিক বিধানসভায় মোট ২৯১৫ জন ও পৌরসভায় আছেন ১৫,৪৯৮ জন।

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় কাজ করে যেসব মহিলা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ২৮৮৪ জন। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও সর্বোচ্চ লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন মোটমাট ৭৫৫ জন।

সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় মহিলা ডাক্তার নার্সের সংখ্যা ২৬৫,০০০ জন। এছাড়া মাতৃত্ব পুরস্কার পেয়েছেন ৭৭,০০০ জন। যেসব মায়েদের সন্তান সংখ্যা দশের ওপর তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইউরোপের অধিকাংশ আপিসে কেরাণী ও টাইপিষ্টের কাজ করে মেয়েরা। পুরুষরা নয়। এই সব মেয়ে কেরাণী বা টাইপিষ্টরা তাদের মনিব বা- কর্তাদের সম্বন্ধে কী ভাবে তার এক জনমত সমীক্ষা করেছে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মাণী, ইতালী, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের মালিক সমিতি।

প্রশ্নপত্রে ছিল আপনার কর্মকর্তা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ? অবশ্য আরও অনেক প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নগুলি যদিও মেয়ে টাইপিষ্ট

কেরাণীদের কাছে বেদনাদায়ক তাহলেও তারা যথাযথ উত্তর দিয়েছে। উত্তরের ফলে কর্মকর্তারা বুঝতে পারছেন কোথায় তাঁদের গলদ বা কাজ বেশী পেতে হলে কর্মচারীদের মতামতও জানা দরকার। কর্মচারীদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে কাজ আরও বেশী তারা ভাল করে পাবে। এই ভরসায়ই তাদের প্রশ্নপত্র রচনা। প্রশ্নে আরও ছিল যে, কর্মকর্তাদের কোন্ কোন্ গুণ থাকা উচিত এবং তাঁদের কি কি দোষ আছে।

পশ্চিম জার্মাণীর মেয়ে কেরাণী বা টাইপিষ্টরা জানিয়েছে যে, কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা থাকা উচিত। এদের কাছে সেই কর্মকর্তাই প্রিয় যিনি কর্মঠ, কাজে দখল আছে এবং প্রয়োজন হলে বাদবিসম্বাদ মেটাতে সমর্থ। এই হচ্ছে জার্মাণ কেরাণীদের কাছে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা। ফরাসী ও সুইডিশ কেরাণীদের কাছে সব চেয়ে খারাপ হল কর্তার বদমেজাজ ও খামখেয়ালী ভাব। তবে জার্মাণদের কাছে এগুলো দোষাবহ নয়।

অধিকাংশ কেরাণীর মতে কর্তার 'মানসিক অসৎ মনোভাব' কারুর কাছেই সমর্থনযোগ্য নয়। শেষ প্রশ্ন ছিল কর্তাদের কেমন লাগে। তার উত্তরে প্রায় সবাই বলেছে "খুব ভাল।" এদের মধ্যে ফরাসী কেরাণীরা আসে সর্বাগ্রে।

ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডেমোগ্রাফি' চর্চা

'ডেমোগ্রাফি' বা লোকসংখ্যা-বিজ্ঞান বয়সে একান্তই নবীন। ধনবিজ্ঞানের প্রথম যুগে লোক-সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হতো। সেটা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর যুগ। লোকসংখ্যা কমতি-বাড়তির উপর অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া তখনও বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হতো না। তারপর সমাজ-বিজ্ঞানের আবির্ভাবে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ডেমোগ্রাফিকে তার মধ্যে টেনে নেওয়া হয়। প্রথমতঃ ধন-বিজ্ঞানের ইতিহাস মাত্র দু-শ' বছরের। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সুরু হয় ধনবিজ্ঞানের চর্চা। আডাম স্মিথের বাজার গবেষণা, ম্যালথুসের লোক-সমস্যা, রিকার্ডোর জমি, রাজস্ব ও ভাড়ার টাকা, তারপর আর এক বিরাট পরিবর্তন আনলেন কার্ল মার্কস তাঁর শ্রমিক-সমস্যা ও শ্রমিকের আয় সম্বন্ধে নতুন তথ্য পরিবেশন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনবিজ্ঞানের চর্চা হতো সামগ্রিকভাবে—যার নাম দিয়েছেন একালের ধনবিজ্ঞানীরা 'মিক্রো ইকনমিক্স'। কেন্স-এর আমলে ধন-বিজ্ঞানের রূপ পরিবর্তন হলো। তিনি সুরু করলেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধনবিজ্ঞানের চর্চা, যার নাম দেওয়া হয় "মাক্রো" ইকনমিক্স অর্থাৎ ছোটখাটো বিষয়ে বা আঞ্চলিকভাবে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা চালানো। তাতে অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনবিজ্ঞানের চর্চা সুরু করেন ভারতে প্রথম দুজন—গোবিন্দ রানাড়ে আর রমেশ দত্ত। তারপর বিস্তৃতভাবে বিকাশ হয়েছে ধনবিজ্ঞান চর্চার।

সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা প্রথম সুরু হয় ফ্রান্সে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক দুর্খাইম সমাজ-বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। তার আগে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা চলান

আর এক ফরাসী দার্শনিক অগুস্ত কঁত। অগুস্ত কঁত-এর 'পজিটিভ্ ইজম' দর্শন চালু করেন সাহিত্যিক বঙ্কিম চ্যাটার্জী। আর দুর্খাইমের সমাজ-বিজ্ঞান চালু করেন বাংলা ভাষায় বিনয় সরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর ধনবিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের যোগসাজসে জন্মলাভ করে 'ডেমোগ্রাফি' বিংশ শতাব্দীতে। তখনও সে বিজ্ঞানের গোত্র লাভ করে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যালথুসের লোকসংখ্যা-চর্চা ছিল কয়েকটি কথার মধ্যে আবদ্ধ, খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে লোকসংখ্যা বাড়ে দ্রুতগতিতে। লোকসংখ্যা কেন বাড়ে, কেন কমে? কোন্ দেশে কত হারে বাড়ছে, সে সম্বন্ধে কোন সঠিক হদিস দিতে পারেন নি ম্যালথুস। বিংশ শতাব্দীতে যখন ধনবিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, ধন-সম্পত্তি ও টাকার উঠতি-পড়তির উপর লোকসংখ্যা বাড়া-কমার অনেকখানি নির্ভর করে, তখন থেকে সুরু হলো 'ডেমোগ্রাফি' বা লোকসংখ্যা চর্চা। ধনবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, এক এক দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিন্নরূপ। কোন দেশে লোক সংখ্যা হঠাৎ বাড়ছে, আর কোন দেশে লোক সংখ্যা কমছে। যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ধাপে ফ্রান্সে লোকসংখ্যা কমেছে, আর জাপানে বেড়েছে।

মানুষের প্রয়োজনের খাতিরেই নতুন নতুন জিনিষের আবির্ভাব হয়। প্রয়োজনের খাতিরেই গবেষণা থেকে আবিষ্কার। একই কারণে 'ডেমোগ্রাফির' আবির্ভাব। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে, তেমনি দেখা দিয়েছে আরও অনেক দেশে। চীন হলো আর এক দৃষ্টান্ত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের এখন খাদ্যাভাব। এ-সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই এবং এই কারণেই আমাদের দেশে ডেমোগ্রাফির প্রসার হতে বাধ্য। বিজ্ঞানসম্মতভাবে লোকসংখ্যা চর্চা সুরু করে জার্মান আর ইতালিয়ানরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। এঁদের মধ্যে অগ্রদূত হলেন ইতালিয়ান

সংখ্যাবিজ্ঞানী কররাদো জিনি। ইনি ছিলেন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। জার্মান আর ইতালিয়ানরা চর্চা সুরু করে দায়ে পড়ে। কারণ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জার্মান আর ইতালিয়ান লোকসংখ্যা বেড়েছে সাংঘাতিকভাবে। সে সমস্যা সমাধানকল্পে তারা ডেমোগ্রাফি-চর্চার সূত্রপাত করে। ফরাসীদের সে বালাই ছিল না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমোগ্রাফির চর্চা তারা সুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। তার মানে এই নয় যে, ফরাসীরা আদৌ লোকসংখ্যার চর্চা করতো না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন ল্য রোয়া-বলিও, হালবাখ্, ল্য ভাস্যর, বুর দঁ, মার্শ-হুব্যর, ব্যতি-যঁ ও ল্যন্দ্রি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানো হতো লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ। তখন তার নাম ছিল ডেমোগ্রাফিক অ্যানালিসিস্, যার অপর নাম হলো 'পিউওর ডেমোগ্রাফি'। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডেমোগ্রাফিকে পাওয়া গেল ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, হিউম্যান জিওগ্রাফি, ইতিহাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের মধ্যে। এই সব বিজ্ঞানের যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা ডেমোগ্রাফির সন্ধান রাখেন অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, ডেমোগ্রাফির চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা উপরিউক্ত বিজ্ঞানের খোঁজ রাখেন। একালে লোক-সংখ্যা-বিজ্ঞানের উপর অনেক বেশী গবেষণা ও কাজ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে 'ইনষ্টিটিউট অব পপুলেশন স্টাডিজ' ইত্যাদির মত অসংখ্য পরিষদ। কয়েকজন মার্কিন গবেষক ও এক ফরাসী লোকবিজ্ঞানী বলেছেন যে, ডেমোগ্রাফি হলো ফলিত বিজ্ঞান (পি, এম, হাউসার এবং ও, ডি ডানকান—"দি নেচার অব ডেমোগ্রাফি", হাউসার ও ডানকান সম্পাদিত "দি ষ্টাডি অব পপুলেশন, অ্যান ইনভেন্টরি অ্যাণ্ড অ্যাপ্রাইসাল," ১৯৫৯ পৃঃ ২৯-৪৪ ; পিয়ের জর্জ—"ল্য ডেমোগ্রাফি, উন্ সিয়ন্স আপ্লিকে"—পপুলেশন, নং ২, ১৯৫৯, পৃঃ ৩০৫-৩১৪)।

ফরাসীদের লোকসংখ্যা পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে প্যারিসে। এটি সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় পরিচালিত। ফরাসী জনস্বাস্থ্য ও লোকসংখ্যা মন্ত্রী দপ্তর এর পরিচালনা করেন। পরিষদের নাম "এ্যাঁস্তিত্যুৎ নাশিওনাল দেতুদ্ ডেমোগ্রাফিক"। প্রথম থেকেই এই পরিষদের ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করে আসছেন অধ্যাপক আলফ্রেড সোভি। আলফ্রেড সোভি এককালে ছিলেন জাতি-সংঘের লোকসংখ্যা ও সংখ্যাবিজ্ঞানের ডিরেক্টর। তাঁরই প্রচেষ্টায় চালু হয় ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংখ্যা পরিষদ ১৯৫৭ সালে। সেই থেকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরু হয়েছে পুরাপুরিভাবে লোকসংখ্যার চর্চা ও গবেষণা। প্রথমেই বলে রাখি যে, ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেদিনও ধনবিজ্ঞানের উপর কোন ডিগ্রী দেওয়া হতো না, তেমনি সমাজ-বিজ্ঞানের উপর। ধনবিজ্ঞানের চর্চা হতো আইন বিভাগে আর সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা হতো দর্শন বিভাগে। মাত্র ১৯৫৮ সালে ধনবিজ্ঞান একটি নতুন বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি লাভ করে। আর সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় আর একটি নতুন বিভাগ খুলে। সেটি হলো হিউম্যান সায়েন্স। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব ডেমোগ্রাফি পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান ও হিউম্যান সায়েন্স বিভাগ যুগ্মভাবে। কিন্তু ডিগ্রী দেওয়া হয় হিউম্যান সায়েন্স বিভাগের তরফ থেকে। প্যারিস ছাড়া বর্দো, লিল্, নাঁসি, কাঁ, লিয়ঁ, তুলুজ ও স্ত্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও আজকাল ডেমোগ্রাফি পড়ানো হচ্ছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দুটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন—ইনষ্টিটিউট অব ডেমোগ্রাফি ও ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব স্ট্যাটিসটিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স ষ্টাডিজ-এ (এই পরিষদ ফ্রান্সের আদমসুমারি, বাজারে তেজী-মন্দী গবেষণা, আমদানী-রপ্তানীর উপর গবেষণা চালায়) ডেমোগ্রাফির চর্চা হয় গবেষণা পর্যায়ে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, জেলা শাসকের তরফ থেকে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা

চালানো হয়। এর বাবদ যে খরচ হয়, তা বহন করে ওই সব প্রতিষ্ঠান। বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এদের কাছ থেকে 'উপদেশ' কেনে এবং বাজারের জনমত এসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তথ্য জেনে থাকে—অবশ্য নগদ মূল্যে।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফি পরিষদ থেকে দেওয়া হয় দুটি ডিগ্রী, একটি হলো ডিপ্লোমা অব জেনারেল ডেমোগ্রাফি, আর একটা হলো ডিপ্লোমা অব এক্সপার্ট ইন ডেমোগ্রাফি। এই দুটি ডিপ্লোমার জন্যে পড়াশুনা করা চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পাশ করবার পর। অধিকাংশ ছাত্র ডেমোগ্রাফি ডিপ্লোমা নেয় ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও ভূগোল পরিষদে পঠন কালে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি ফ্যাকাল্টির অধ্যাপক এই পরিষদে পড়িয়ে থাকেন; যেমন—ধনবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, হিউম্যান সায়েন্স অ্যাণ্ড লেটার্স। লোকসংখ্যার উপর গবেষণা শুধু ইনষ্টিটিউট অব ডেমোগ্রাফিতেই হয় না, হয়ে থাকে বিভিন্ন ধনবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে, ভূগোল পরিষদে, সংখ্যা-বিজ্ঞান পরিষদে, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদে। এই সব পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক একটি অঙ্গ। তবে ডেমোগ্রাফির ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের সময় এক থেকে দুই বছর। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়তে হয়—জেনারেল ইকনমিক্স ও ডেমোগ্রাফি, থিওরি অব ডেমোগ্রাফি, পলিটিক্যাল ইকনমিক্স, মডার্ণ ও কণ্টেম্পোরারি হিষ্ট্রি, হিউম্যান অ্যাণ্ড ইকনমিক জিওগ্রাফি, হিষ্ট্রি অব পপুলেশন, হিষ্ট্রি অব পপুলেশন ডকট্রিন, হিউম্যান অ্যাণ্ড জেনারেল ইকোলজি, বাইওমেট্রি অ্যাণ্ড পপুলেশন, জেনেটিক্স, কলেকটিভ প্যাথোলজি অ্যাণ্ড কোয়ালিটেটিভ ডেমোগ্রাফি, সোস্যাল লেজিসলেশন, জেনারেল স্ট্যাটিস্‌টিক্স, ডেমোগ্রাফিক স্ট্যাটিস্‌টিক্স।

আজকাল এরা সংখ্যাবিজ্ঞানের উপর খুব বেশী জোর দিচ্ছে। ডেমোগ্রাফিতে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ হলো আসল উদ্দেশ্য। তাই পরীক্ষায় অর্ধেক প্রশ্নপত্র থাকে সংখ্যাবিজ্ঞানের উপর

ভিত্তি করে। তাছাড়া হাতেকলমে কাজ করতে হয়। মানচিত্রে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ, চার্ট, গ্রাফ ইত্যাদি তো আছেই। আমি প্যারিসের ডেমোগ্রাফি গবেষণায় দেখেছি, এরা রিজিওনাল অথবা লোকালাইজড্ ক্ষেত্রে প্রতিটি লোকের ইতিবৃত্ত, পরিবার ও জনসমষ্টির স্বাস্থ্য, খাদ্য, আবাস, রুজি-রোজগার, রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যুর হার, তাদের সুবিধা-অসুবিধা, তাদের মতামতের উপর অনুসন্ধান কার্য চালায়। এথেকে অনেক অজানা তথ্য জানা যায়, যার উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আরোপ করা চলে।

ডেমোগ্রাফি পরিষদে গবেষণাকালে আমি দেখেছি যে, যে কোন দেশে এবং যে কোন সময়ে লোকসংখ্যা দৌড়ঝাঁপ দিয়ে বাড়ে না। বৃদ্ধির একটি রীতি আছে, যার নাম রিদ্‌ম্। বড় দেশে এক একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যেমন ভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাল-চাল, ধর্ম, সংস্কৃতিও ভিন্ন। এক একটি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিন্নরূপ। এরা সবাই কিন্তু একই হারে বাড়ে না। প্রতিটি সম্প্রদায়ের সমষ্টি ও গোষ্ঠীর মনোবৃত্তি, শিক্ষার ধারা ও সংস্কৃতি একই নয়। যার অপর নাম দেওয়া হয়েছে টেক্‌নিক্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভেলপমেণ্ট। টেকনো-কালচারাল প্রগতির উপর নির্ভর করে লোকসংখ্যার ক্ষয়-বৃদ্ধি। অতি প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক স্তরের জীবনধারণ করে যে সব সম্প্রদায়, যেমন—আদিবাসী বা আফ্রিকার জঙ্গলবাসীদের সমাজে লোকসংখ্যা লাফ দিয়ে বা হুহু করে বাড়ে না। এর পরের ধাপ হলো শিল্প-সমাজে প্রবেশ করতে সুরু করেছে কৃষি-সমাজ। তারা নীচু ধাপ থেকে যন্ত্রযুগের ধাপে যেই পৌঁছায়, তখনই তাদের মধ্যে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। যেমন হচ্ছে ভারতে, চীনে, ইন্দোনেশিয়ায় বা এশিয়ার অন্যান্য জনপদে। যন্ত্রযুগে এসে যারা উচ্চ শিখরে পৌঁচেছে বা যাদের জীবনযাত্রার মান উঁচুতে উঠেছে, তাদের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারে আসে সমতা। তখন বেশী

বাড়েও না আর বেশী কমেও না। যেমন দেখা যাচ্ছে একালের ইউরোপে। ভারতে এর দৃষ্টান্ত ভাল করে দেখা যায়। যেমন আদিবাসীদের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার তেমন বাড়ে নি, যেমন বেড়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক ও কলকারখানায় শ্রমিক সমাজের মধ্যে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে জনসংখ্যার হার বাড়ছেও না আবার কমছেও না। ভারতের লোকসংখ্যা সমস্যার এটাই হলো একটি দৃষ্টান্ত; অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান বাড়লেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমতা আসে এবং তার জন্যে চাই আর্থিক উন্নতি। আর আর্থিক উন্নতি আসতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান টেকনোলজির উন্নয়নে। কলকারখানা ও শিল্পোন্নয়নই তার একমাত্র পথ—যার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

প্যারিসের ডেমোগ্রাফি পরিষদে যাঁরা অধ্যাপনা করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক আলফ্রেড সোভি, পিয়ের জর্জ, শভালিয়ের, রেনার্ট, জিরার, স্টোয়েৎজেল, বুকে ইত্যাদি। অধ্যাপক বুকের সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তক 'অপটিমাম পপুলেশন'-এ তিনি বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যা-বিজ্ঞানীদের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর বইয়ে তিনি ভারতের কয়েকজন ডেমোগ্রাফারের আলোচনা করেছেন—তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী, অধ্যাপক বিনয় সরকার ও জ্ঞান চাঁদ।

ডেমোগ্রাফি পরিষদের দ্বৈমাসিক পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন সংখ্যাবিজ্ঞান পত্রিকা, ধনবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান ও ভূগোল পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় ডেমোগ্রাফি সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু।

"বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলেনা"

স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সম্বন্ধে কুসংস্কার ধুলিসাৎ করতে চলেছে এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা। আকাশেরও উর্ধ্বে মহাকাশে রুশ ও মার্কিণ মহাকাশ বিচরণকারিদের কার্যের প্রত্যক্ষ ফল আপনারা দেখেছেন। আকাশের ওপরে মহাকাশ জগৎকে আমরা বলে থাকি স্বর্গ। সেখানে প্রায় কুড়ি মিনিট কাটিয়েছে রুশ ও মার্কিণ মহাকাশ-চারিরা। এর পরের পরিচ্ছেদ আরও কৌতূহলজনক।

একটি সংবাদ ইউরোপ-আমেরিকা বৈজ্ঞানিকদের বিচলিত করেছে। মস্কোর স্টার্নবার্গ পরিষদের দুই বৈজ্ঞানিক যা বলেছেন তা সত্যি চাঞ্চল্যকর। তাঁরা বলেছেন যে, অন্য কোনো এক গ্রহ থেকে তাঁরা সব কয়েকটি বেতার সংকেত পেয়েছেন। সেই গ্রহের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছে 'সি, টি, এ—১০২'। কয়েকজন রুশ বৈজ্ঞানিকের মতে অন্য একটি গ্রহে হয়ত আমাদের পৃথিবীর চেয়েও উন্নত ধরণের সভ্যতা রয়েছে। তারাও হয়ত কোনো রকেট পাঠিয়েছে আমাদের গ্রহে পর্যবেক্ষণ করতে।

ইংলণ্ডের 'জডরেল ব্যাঙ্ক-'এর সুবৃহৎ পর্যবেক্ষণাগারও অনুরূপ অজানা সংকেত ধরতে পেরেছে। জড্রেল ব্যাঙ্ক-এর বৈজ্ঞানিকেরা রুশ বৈজ্ঞানিকদের সাথে একমত হতে পারেনি। বৃটিশদের সাথে যোগ দিয়েছে মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু তারা-এই সংকেত-গুলোকে একেবারে উড়িয়ে দেয় নি। তারা বলেছে যে, এখনই কোনো সমাধানে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলা হবে অন্য কোনো গ্রহ আমাদের চেয়ে বেশী অগ্রসর কিনা।

যে কালে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চলেছে প্রাচীন মতবাদ ভেদ করে ' ঠিক সেই সময়ে ইউরোপ-আমেরিকার মত উন্নত দেশে

চলেছে তুক্-তাক্ ঝাড়-ফুঁক মন্ত্রের দিগবিজয়। আমাদের দেশের কথা না বলাই ভাল। কারণ ওগুলো আমাদের সামাজিক জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না এমন অনেক ঘটনা ঘটে প্রতিটি দেশে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও মেলেনি। তবে বৈজ্ঞানিকেরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। একটি উদাহরণ এখনই দেওয়া চলে। যেমন হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া। হাত দেখার ফলাফল সব সময়ে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু হাতের রেখায় কেন অনেক ভবিষ্যদ্ বাণী করা চলে তার কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দেখাতে পারেনি আমাদের দেশের হাত দেখার জ্যোতিষীরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও স্বাস্থ্য দপ্তর এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'হস্তরেখা' সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। হাতের রেখা দেখে রোগ সম্বন্ধে আভাস লাভ করাই এদের উদ্দেশ্য। এরা বলেছে যে, হাতের রেখা দেখে যদি চট্ করে ডাক্তার কোনো রোগ ধরতে পারে তা হলে মন্দ কী। হাতের রেখায় হয়ত কোনো রোগের প্রতিকার করে দেওয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু রোগ সম্বন্ধে স্থির হওয়া যাবে। মার্কিন স্বাস্থ্য দপ্তর বলেছে যে, তারা হাতের রেখার একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা গ্রহণ করতে চান। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসতে গেলে প্রথমে চাই পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ ও ব্যাখ্যা। তাই তারা দশ হাজার বিভিন্ন লোকের হাতের ছাপ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে। দশ হাজার হাতের ছাপ থেকে এরা প্রমাণ যাচাই করে দেখবে কার কী ধরণের রোগ আছে। প্রতিটি হাতের ছাপের সাথে আছে ওই লোকের শারীরিক বৃত্তান্ত, রোগ-বিরোগের ইতিহাস। দশ হাজার হাতের ছাপ দেখে পরীক্ষার ফল বলা হবে দেড় বছর পরে। তাহলে ছোট বেলায় কোনো ছেলের হাতের রেখা দেখে বলা চলবে যে, এর এই রোগ

আছে বা হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তার চিকিৎসা প্রথম থেকে সুরু হবে। ফলে রুগীব সংখ্যা কমবে।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না এমন অনেক ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন বিশ্বের সর্বত্র। ডাক্তার বদ্যির চিকিৎসায় যখন কোনো রোগ সারতে চায় না তখন রুগী অন্য কিছুর সাহায্য নেয়। মন্ত্র ঝাড়-ফুঁক তুক্-তাক্ চিকিৎসা চলে ইউরোপময়, তবে আমাদের মতন নয়। এই ধরনের বে-আইনি ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে বর্তমান ফরাসী সরকার। কিছুকাল আগে ফরাসী সরকার এক নতুন আইন জারী করে বলেছে যে, এই সব ঝাড়-ফুঁক, তুক্-তাক্ বা অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন যেসব ব্যক্তিরা চিকিৎসার ব্যবস্থা চালিয়ে থাকে তাদের আইনত কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এই আইনের ফলে অনেক 'ওঝা' বা অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বছর দুয়েক আগে এক ফরাসী চিত্রাভিনেত্রী মাদমোয়াজেল মিক্ মিশেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কয়েকজন। মাদমোয়াজেল মিক্ মিশেল নাকি শুধু হাতের স্পর্শে রুগীর রোগ নিরাময় করতে পারত। যাই হোক মিক্ মিশেল রোগ সারানর কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন প্যারিসের 'কাজিনো দ্য পারী' নাইট ক্লাবের প্রধান নর্তকীর কাজ করছে।

ফ্রান্সের অনেক গণ্ডগ্রামে দেখেছি এখনও 'পানি বাবা'র দল বেশ কাজ করে চলেছে। এরা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে মাটি ছুঁয়ে বলে দেয় কোনখানে মাটির নিচে জল পাওয়া যাবে।

সব চেয়ে আশ্চর্য করেছে প্যারিসের বিখ্যাত রেডিও ষ্টেশন ইউরোপ নং ১'। এই রেডিও প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারি। রেডিও ইউরোপ নং ১ মারফত প্রতিদিন প্রচারিত হয় আবহাওয়া সংবাদ। বৃষ্টি হবে না রোদ উঠবে এই নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনেকেই মানতে চায় না এই কারণে যে ওরা যা ঘোষণা করে তার অনেকখানি ফলে না। কিন্তু

'ইউরোপ নং ১' এর আবহাওয়া খবর যিনি সরবরাহ করেন তিনি কিন্তু আবহাওয়া বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞানের ধারে কাছে যান না ইনি। এঁর নাম মঁঃ আলবেয়র সিমঁ। এই ভদ্রলোক শুধু মাত্র মেঘ, মেঘের গতি এবং তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে বলে দিতে পারেন আকাশে রোদ উঠবে, না হবে বৃষ্টি। এঁর যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু নেই। যা আছে তাও প্রাগৈতিহাসিক। ইনি রেডিওর আবহাওয়া বিশেষজ্ঞের কাজ করার আগে দু বছর কাজ করেছেন মার্কিন টি ডব্লু, এ বিমান কোম্পানীতে আবহাওয়ার বিশেষজ্ঞের কাজ। এঁর কাছে অনেক যুবক-যুবতী আসে জানতে যে তাদের বিয়ের দিনে রোদ উঠবে না বৃষ্টি হবে। সেই বুঝে তারা বিয়ের দিন নির্ধারিত করে। যাই হোক মঃ আলবেয়র সিমঁর আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী অনেকেই মনে করে প্রায়শই ঠিক ঠিক ফল দেয়।

যারা অতীন্দ্রিয় শক্তি বলে রোগ সারাতে পারে, বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে তাদের সংখ্যা ইউরোপ আমেরিকার কম নয়। একমাত্র ফ্রান্সের পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তি এই সব কাজ করে থাকে। সরকারি হিসাবে প্যারিসে ছয় হাজার 'মিষ্টিক' পেশায় নিযুক্ত। তাদের আয়ের ওপর সরকার কর ধার্য করার সময়ে মুশকিলে পড়ে। এরা যদি বলে চিকিৎসক তাহলে বেআইনি, এদের পেশার সংজ্ঞা নির্ধারণে সরকার বেশ চিন্তাগ্রস্ত। এদের সম্বন্ধে সম্প্রতি দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে। 'মিষ্টিক' গুরুদের চেলা সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অনেক সময় অনেক গুরুর কুকার্য ধরা পড়ে জেলে যেতে হয়েছে তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ চায় এক অজানা 'মিষ্টিক' বা তুক্-তাকের রাতারাতি ফল। প্যারিসের স্যাঁ লাজার ও ক্লিশি অঞ্চলে হস্তরেখা বিশারদ, ভৌতিক জ্যোতিষীর দোকান অনেক। এরা ভাল রোজগার করে। তাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নিয়মিত বিভিন্ন পত্রে।

ইউরোপের ছয় রাষ্ট্রের 'কমন মার্কেট' সংস্থার এক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এই ছয়টি দেশে প্রায় শতকরা ষাটজন পাঠক নিয়মিত ভাবে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত জ্যোতিষীর ফলাফল পড়ে থাকে। 'ইউনেস্কো'র এক তথ্য থেকে জানা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইৎজারল্যাণ্ডের মিলিত ২২৮৮টি দৈনিক পত্রিকায় প্রতিদিন প্রকাশিত হয়, গ্রহ-নক্ষত্র ও জ্যোতিষীর 'আজকের দিনটা কেমন যাবে' বা 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' ভবিষ্যৎবাণী।

মন্ত্র, তুক্-তাক্ ও ভৌতিক বিদ্যার ওপর এখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলেছে ইউরোপের অনেক দেশে। মঃ ঈভ্ রোকা নামে এক ফরাসী অধ্যাপক গত দুবছর ধরে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যাচ্ছে 'পানি বাবা'দের ওপর। মাটির নিচে কোন জায়গায় জল পাওয়া যায় তার সন্ধান পানিবাবারা কী করে পায় তা জানাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

'টেলিপ্যাথি'র ওপর সত্যিকারের গুরুতর ভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যাচ্ছে রুশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা। 'স্পুটনিক' ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানীদের আটটি ল্যাবরেটরিতে এখন চলেছে অনুসন্ধান কাজ। একজনের চিন্তা আরেকজনের কাছে বিনা যন্ত্রে যদি পাঠান সম্ভব হয় তাহলে ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজয়ের পথ সুগম করবে। মার্কিনদের রকেট ক্ষেপন ও মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র এন, এ, এস, এতে চলছে টেলিপ্যাথির ওপর গবেষণা। তারা চায় জলের নিচে সাবমেরিনে কর্মরত ইঞ্জিনিয়রদের সাথে মাটির ওপর অন্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিনা যন্ত্রে মানসিক যোগাযোগ। মার্কিন বিজ্ঞানীরা আরও দূরে যেতে চায় এ ব্যাপারে। তারা চায় টেলিপ্যাথি যোগে মহাকাশ বিচরণকারীদের সাথে মর্তের এঞ্জিনিয়ারদের মানসিক যোগাযোগ। তাহলে যান্ত্রিক যোগাযোগে বিভ্রান্ত হতে হবে না।

—শেষ—

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা—লাইন	ছাপার ভুল	শুদ্ধ
২— ৪	বলো৷	বলো৷
৪— ২৩	গ্লৌবদিব	প্লোবদিব
৫— ২	”	”
৬— ২৩	ভোরা	ভোয়া
৮— ৪	জাত-বাতের	জাত-পাতের
১৬— ১৪	বিজ্ঞানুতত্ত্বের	বীজাণুতত্ত্বের
৩৭— ১৪	ভিব্‌বুলে	ভিব্‌লে
৪১— ১৭	ফলেত	কলেত
৪৫— ৫	মুনের	জলের
৪৭— ১৪	আলজাস´, শ্যাম্পান	আলজাস্‌, শাম্পাইন
৮৬—২,২০	মনুষ্যতত্ত্বে, ঝোলে	নৃতত্ত্ব, পোল
৯৩— ১০	কোন বীজের	ফোন ভীজের